KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল- ১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : Award Issue 6/3 6/4 7/2	Year of Publication : April 1983 April - June 1983 July - Sep 1983 May 1984
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

২২

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

ভারতশিল্পী নন্দলাল		পঞ্চানন মণ্ডল ৮'০০
প্রাচীন ভারতে নারী		ক্ষিতিমোহন সেন ৮'০০
শ্রীপদমেরু গ্রন্থ		দ্বিজমাধব সংকলিত ৬০'০০
স্কুল-নথি-সংকলন ১	সংকলক :	বুদ্ধদেব আচার্য ৬৫'০০
স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য		পশুপতি শাসমল ৩৪'০০
পুঁথি পরিচয় ৪		পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ৫০'০০
রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা		নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১২'০০
চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা		ভি. ভি. ওয়াজেলওয়ার ১২'০০

Indological Studies	P. C. Bagchi	65·00
Visva-Bharati Journal of Research	Vol V Part I	16·00
Introduction to Parsee Religion		12·00
Custom and Ceremonies	Madhusudan Mallik	12·00
The Emperor and the Subordinate Rulers	D. C. Sircar	20·00
The Decline of Buddhism in India	R. C. Mitra	24·00
Contribution to a Bibliography of Indian Arts and Aesthetics	Haridas Mitra	35·00
Descriptive Morphology of Oriya	G. N. Dash	20·00
Niamatulla's History of the Afghans	N. B. Roy	10·00
A Chronicle of Buddhism in China	Jan yun-Hua	20·00

VISWA BHARATI RESEARCH PUBLICATIONS COMMITTEE

Santiniketan—731 235

সূচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা ১৩৯০

বিভাব

প্রবন্ধ

তুমি আমাদের চেনা ? নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১৭

বাংলা কারক-বিভক্তি। পবিত্র সরকার ১১৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজকের পৃথিবী ও জনসংযোগ। প্রদীপচন্দ্র বসু ৩৮

অনুবাদ

মিরোস্লাভ হোলুবের কবিতা। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪

আলাপচারীতায় কাফকা। গুস্তাভ যানুখ

ভাষান্তর : কমলেশ চক্রবর্তী ১২৯

কবিতাগুচ্ছ

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৯

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি কবিতা

গল্প

সমুদ্রযাত্রা। শচীন দাশ ৬৭

অমাতৃক। কল্যাণ মজুমদার ৯৪

আলোচনা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত কবিতা পরিচয় প্রসঙ্গে

নমিতা বসুমজুমদার ৮০

Children of the Mire। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪

ব্যক্তিগত রচনা

ফাইল ঘটিত। সুমঙ্গল বসু ৮৯

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

প্রদীপ দাশগুপ্ত　　শচীন দাশ

সুবিমল লাহিড়ী　　দেবীপ্রসাদ মজুমদার

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলকাতা-৭০০০১৭

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ/অনুপ রায়

অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়্যান্ট্ প্রসেস্

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯ এবং করুণা প্রিণ্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

তুমি আমাদের চেনা ?

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন চীনভ্রমণে যান, তখন একদিকে যেমন রাজোচিত সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই প্রচণ্ড (যদিও ভদ্র) প্রতিরোধ হয়েছিল।

দেশে ফেরার পর ২২শে জুলাই ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে তিনি যে বক্তৃতা দেন এবং যেটা প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩১ সংখ্যায় ছাপা হয়, তাতে তিনি বলেছিলেন,

"নিছক সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সেখানেও এক দল লোক আছে। তাও বলি তাদের দল খুব ভারী নয়, তারা বলে, 'এ-লোকটি ভারতবর্ষ থেকে এসেছে আমাদের মাথা খারাপ করতে, আমরা এখন এই সমস্ত কথা, ভারতবর্ষের বাণী, বৌদ্ধ-ধর্ম যা দিয়েছে, শুনতে পারিনে। তাতে ক্ষতি হয়েছে, গায়ের জোর কমিয়ে দিয়েছে, হিংসা প্রভৃতি খর্ব করেছে। এ লোকটি একে কবি, তাতে ভারতবাসী, এ আমাদের মাথা খারাপ করতে পারে।···এরা কিম্বা আর যে কোন বিরুদ্ধবাদী কেউ থাকুক না, আমাকে কেউ অসম্মান-সূচক কিছু বলেনি, personality নিয়ে কিছু বলেনি। বারবার বলেছে, আমরা এঁকে অসম্মান করতে চাইনে, ওঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। আতিথ্যের বিরোধী কোনো কাজ তারা করে নি। ভদ্রতা রক্ষা করেছে। তারা বলেছে, এতে তাদের ক্ষতি হবে। ব্যক্তিগত-ভাবে আমার প্রতি তাদের কোনো বিরোধ নেই, যদিও বক্তৃতার ফলাফল লক্ষ্য করে তারা

বিচলিত হয়েছে। কটু কথা বলেনি, চিরাচরিত হৃদ্যতা বিস্মৃত হয়নি। সুতরাং বহুযুগের যে-সাধনা সেইটেই মর্মগত—চীন-জাপানে তা দেখেছি।"

ওই বক্তৃতাতেই রবীন্দ্রনাথ জানালেন, প্যান-এসিয়াটিক মিলনের দুঃস্বপ্ন কথা তিনি বলেন না, হৃদয়ের মিলন, পূর্বাপর যে মিলন আছে, ধর্মগত ঐক্য, সেটাকে সঞ্জীবিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য, পোলিটিক্যাল শক্তি নয়। পরস্পরের সঙ্গে আদানপ্রদানের ভিতর মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ, ইন্টারডিপেণ্ডেন্স, চীন জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হবে, এটাই রবীন্দ্রনাথের আশা।

রবীন্দ্রনাথ যখন চীন দেশে যান তখনকার বিস্মৃত বিবরণ আমরা পেয়েছি Stephen Hay'র Asian Ideas of East and West গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন তা অসম্পূর্ণ হলেও রক্ষিত হয়েছে Talks in China গ্রন্থে! গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বর্জিত হয় রবীন্দ্রনাথ পরে সম্পাদনা করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেই সময়কার চীনের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিচয় কিছুটা পাওয়া যাবে Jonathan Spence-এর The Gate of Heavenly peace গ্রন্থে। এই তিনটি গ্রন্থ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণ পর্যায়টি আরেকবার লক্ষ্য করা যেতে পারে।

১৯২৩ সালে Beijing Women's Normal College-এ Lu Xun (১৮৮১-১৯৩৬) একটি বক্তৃতা দেন, বিষয় : বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর নোরার কী হলো? লু শুনের কাছে মনে হয়েছিল, নোরার কাছে তিনটি রাস্তা খোলা ছিল, খেতে না পেয়ে মরে যাওয়া, বখে যাওয়া; স্বামীগৃহে ফিরে আসা। অগ্রসর ইউরোপে নোরা যা করতে পারে, পশ্চাৎপদ চীনে সাধারণ মেয়েরা তা করতে পারে না। অতএব ইবসেনের নোরা-কে নিয়ে চীনে মাতামাতি নিরর্থক। ১৯১৮ সালে চীনা ভাষায় অনুবাদ হলে ইবসেনের নাটকটি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং নোরা চীনা মেয়েদের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে, কেননা ওই সময় থেকেই চীনে নারীমুক্তি আন্দোলন গতি পেয়ে গেছে।

মনে করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪) লিখলে বিপিনচন্দ্র পাল সঙ্গে সঙ্গে "মৃণালের পত্র" লিখেছিলেন, যে যুক্তিতে পরে লু শুন আপত্তি করবেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিপিনচন্দ্রের আপত্তি মনে হয়েছিল মূঢ়তা।

চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা শিল্পসংস্কৃতির তীব্র সমালোচক ছিলেন লু শুন এবং চীনের প্রাচীন সভ্যতায় মুগ্ধ ব্যক্তিদের বিরোধিতা করে চলেছিলেন।

যাঁদের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের একজন Liang Shuming। এই আশাবাদী শুমিঙের কাছে তখন ছিল তিনটি রাস্তা। ১৯২১ সালে তিনি লিখেছিলেন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং দর্শন' গ্রন্থটি। একটি বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক যাঁরা তাঁরা এই ভেঙে-পড়া বাড়িটি একেবারে ভেঙে ফেলে নতুন করে বাড়িটি গড়ে তুলতে চাইবেন। চীনের উত্তর হবে, বাড়িটি সযত্নে মেরামত করে নেওয়া। আর ভারতের উত্তর হবে, বাড়িতে থাকার ইচ্ছাটাকেই নির্মূল করা। রবীন্দ্রনাথ যখন চীনভ্রমণে যান তখন ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে এই ছিল মোটামুটি চীনের বুদ্ধিজীবী মহলের ধারণা।

Beijing বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের এই জনপ্রিয় অধ্যাপকের গ্রন্থটি ১৯২৬-এর মধ্যে সাতটি সংস্করণ হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগ্রামের তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করেন নি, তাঁর ছিল চীনের সমন্বয়ের তত্ত্ব। ভারতীয় নির্বাণ তত্ত্বও তিনি গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রদর্শনকে শুমিঙ স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁর নির্বাণতত্ত্ব সত্ত্বেও, কারণ তাঁর ধারণায় রবীন্দ্রদর্শন আসলে সমন্বয়ের দর্শন, চীনা দর্শনেরই আর এক রূপ। কনফুসিয়সের ভক্ত শুমিঙের কাছে, রবীন্দ্রনাথও কনফুসিয়সের পথের পথিক। রবীন্দ্রনাথকে যখন Throne Half of Imperial Splendour-এ সংবর্ধনা জানান হয়, যে পঞ্চাশজনের মতো বিদ্বজ্জনের সমাবেশ সেখানে হয়েছিল, শুমিঙ তাঁদের মধ্যে ছিলেন। কালিদাস নাগকে তিনি জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে দেখে তিনি মুগ্ধ। চীনের কাগজেপত্রে যখন তুমুল আলোড়ন চলছে রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণ নিয়ে, স্বপক্ষে যতটা বিপক্ষে তার অনেক বেশি, শুমিঙ কিন্তু কোনো তর্কে যান নি। অথচ তাঁরই যাওয়া সবচাইতে স্বাভাবিক ছিল। কিছুকাল পরেই তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো গ্রামোন্নয়নে মন দেবেন অধ্যাপনা ছেড়ে, কনফুসিয়াসের ভক্ত এই শুমিঙ পাশ্চাত্য সভ্যতার হাত থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবেন। প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে কনফুসিয়াসেরই নামান্তর ছিল।

লু শুন রবীন্দ্রনাথকে একবারই দেখেছিলেন একটি ভোজসভায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করেন নি। তবে তাঁর ছোট ভাই, Beijing বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, Chou Tso-jen, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো বিশেষ কৌতূহল বোধ করেন নি। True Light Theatre-এ দ্বিতীয় বক্তৃতাটি শুনে তাঁর মনে হয়েছিল দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কিছু বলার নেই। চীনের

জনসাধারণের বোধশক্তি খুবই অল্প, রবীন্দ্রদর্শনে তারা খুব প্রভাবিত হবে, এমন কোন আতঙ্কের কোনো কারণ নেই, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণে এমন ভয় পাবার কী আছে? কয়েকটি প্রবন্ধ বেশি লেখা হবে, সভায় কিছু হৈচৈ হবে, Beijing এর নিরামিষ রেস্তরাঁগুলোতে একটু বেশি লোক যাবে এবং বিদেশি বইয়ের দোকানে বই বিক্রি একটু বাড়বে, রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণের এই হলো ফলাফল, জানালেন Chou Tso-jen।

রবীন্দ্রনাথ চীনভ্রমণের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ১৯২৩ সালে। চীন সম্পর্কে তাঁকে কৌতূহলী করে তুলেছিলেন ১৯২১-২২ সালে সিলভাঁ লেভি, চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক একসময়ে গভীর ছিল এবং বিশ্বভারতী পরিকল্পনায় এই যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করা অবশ্য কর্তব্য, এই কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে এলমহার্স্ট চীনে গিয়েছিলেন ১৯২৩ সালে, চীনভ্রমণ কতটা সম্ভব জানার জন্য। রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে এলমহার্স্টের সঙ্গে পরিচয় হলো Chu Shih-ying, একজন তরুণ-দার্শনিক, এবং Xu Zhimo, একজন তরুণ কবির। এলমহার্স্ট যখন জানালেন, রবীন্দ্রনাথ চীনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, যদি চীনভ্রমণের খরচ সংগ্রহ করা যায়, তখন এই দুই তরুণ আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠেন এবং Zhang Jumai ও Liang Richao এই দুই প্রবীণের কাছে দৌড়ে যান। অবিলম্বে রবীন্দ্রনাথকে ১০০০ ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যাতায়াতের খরচের জন্য। রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ জানালেন Society for Lectures on the New Learning। এই সমিতি রবীন্দ্রনাথের আগে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন Bertrand Russel, John Dewey এবং Hans Driesch কে।

চীনভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ বোধ করেছিলেন, চীনকে তাঁর বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য জানাতে পারবেন এবং প্রতীচ্যকে প্রাচ্যের বাণী শোনাতে হবে, এই কার্যে চীনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হয়েছিল, চীনের ছাত্র বা বিদ্বৎসমাজ তাঁর বাণী শুনতে চায় নি, সেটা তিনি ভ্রমণের সময়েই বুঝতে পেরেছিলেন। সাংহাইতে প্রথম বক্তৃতা দেবার সময়েই ছাত্ররা পতাকা দেখিয়ে তাদের আপত্তি জানাতে শুরু করে, ফলে তখনই রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন : প্রথম নিমন্ত্রণ পাওয়ার পর তিনি নিঃসংশয় ছিলেন না, চীন কেন তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, কী তাঁর কাছ থেকে শুনতে চায়। তিনি কবি, কর্মী নন, দার্শনিকও নন, কবির কাছে তারা কী প্রত্যাশা করে। কিন্তু শীতের পর বসন্তের আগমনে

তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল, তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। বললেন তিনি যাবেন কবি হিসাবে, কর্মী বা দার্শনিক হিসাবে নয়। অনাগত দিনের, ভবিষ্যৎকালের, কথা কেবল কবিই জানাতে পারেন। এবং তিনি জানাবেন এশিয়ার স্বপ্ন—সেই স্বপ্ন সংগ্রামের নয়, লাভক্ষতির নয়, সেই স্বপ্ন আত্মিক যোগাযোগের। সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে এশিয়াই সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবে।

যে সমিতি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সেই সমিতির বিরুদ্ধেই চীনের তরুণ এবং বিদ্বৎসমাজও আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। Guo Moruo ১৪ই অক্টোবর ১৯২৩ তারিখে Creation Weekly পত্রিকায় লিখেছেন My View of Tagore's visit to China। Mao Dun লিখবেন Republic Daily, Awakening সংখ্যায়, ১৪ এপ্রিল ১৯২৪ : What we expect of Tagore। Qu Qiubai লিখবেন Tagore's Concept of the Nation-State and the East ১৬ এপ্রিল ১৯২৪। এঁরা তিনজনই মার্ক্সীয় সাহিত্যে বিশ্বাসী এবং রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিরোধী। কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি (১৯২১ সালে চীনে এই পার্টি তৈরি হয়েছে) Chen Duxiu, যিনি ১৯১৫ সাল থেকে চীনের New Thought Movement-এরও উদ্যোক্তা, রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে বিরোধী। ১৯১৫ সালেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে পলায়নী মনোবৃত্তির কবি বলে মনে করেছিলেন; ২৭ অক্টোবরের ১৯২৩ তারিখের একটি পত্রিকায় লিখলেন, Why do we welcome Tagore? "Having added to the chaotic thought of Lao-tzu and Chaung-zu the chaotic thought of Buddhism, we have suffered enough, and are more than grateful to the Indians for their gifts. Now there is no need to add Tagore to all this."

১৯৪১ সালে চীন থেকে Tai-chi-Tao শান্তিনিকেতনে এলে রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ ও তাই-চী-তাও সংবাদ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, পৌষ ১৩৪৭, প্রবাসী) 'চীনের জাতিসংগঠনকার্যের যে সূচনা আমি দেখিয়া আসিয়াছি' সেই সংগঠনকার্য। কিন্তু ১৯২৪ সালে চীনে তিনি সংগঠন দেখে এসেছিলেন সেটা তাঁর পক্ষে আদৌ সুখপ্রদ হওয়ার কথা নয়। তখন চলছিল প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির তীব্র বিরোধ। নবীনদের কাছে লাও-সেকে মনে হচ্ছে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল দর্শন এবং এই নবীনদের কাছেই রবীন্দ্রনাথ প্রচার করবেন প্রাচীন ঐতিহ্যের বাণী। এলমহার্স্ট ১৯২৩ সালে চীন পরিদর্শনে

গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু এই নতুন জীবনদর্শনের কোনো আঁচ পান নি, রবীন্দ্রনাথকে সেবিষয়ে অবহিতও করেন নি। বরং, জাহাজে বসে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লাও-সে পড়তে দিচ্ছেন, লাও-সে পড়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হচ্ছেন। উপনিষদের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন, চীনে বিশ্রাম করার সময় **Civilization and Progress** প্রবন্ধে লাও-সের সঙ্গে উপনিষদের সাদৃশ্য দেখাবেন এবং ১৯৪১ সালেও তাও-চী-তাওকে বলবেন লাও-সের সঙ্গে উপনিষদের সাদৃশ্য আছে। তিনি কিন্তু জানেন না, চীনের তরুণ সমাজের কাছে লাও-সে, কনফুসিয়াস এবং বুদ্ধ অস্পৃশ্য। যদি জানতেন তাহলে হয়ত সাদৃশ্য আছে এটা না বলে, বুদ্ধ বা লাও-সে যে কেন গ্রহণযোগ্য সেটা আলোচনা করতেন।

চীনভ্রমণের সময় অধিকাংশ স্থলেই রবীন্দ্রনাথ জানতেন না, যাদের কাছে তিনি ভাষণ দিচ্ছেন, প্রাচীন সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করছেন তারা কারা! নানকিঙে ২০ এপ্রিল তিনি সামরিক শাসক গভর্ণর চি শিয়ে-উয়ান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সংগ্রাম-বিরোধী তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন, মুগ্ধ জেনারেল রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন তিনিও শান্তির পূজারী এবং পাঁচ মাস পর চেকিয়াঙ আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে জাপানে পালিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই অজ্ঞতা এবং তজ্জনিত অমর্যাদার জন্য বেশ কিছুটা দায়ী এলমহার্স্ট যাঁকে তিনি পাঠিয়েছিলেন চীনে যাওয়া সমীচীন হবে কি না জানার জন্য। এলমহার্স্ট চীন পরিদর্শন করে এসে বলেছিলেন চীনভ্রমণ সার্থক হবে। চীনে যে রবীন্দ্রনাথের অমর্যাদা হয়েছিল সেটা তিনি ভালোই জানতেন কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকার করেন নি। **Rabindranath Tagore's Visit to China** প্রবন্ধে (আগস্ট ১৯২৪, মডার্ণ রিভিউ) তাই তিনি লিখবেন চীনে রবীন্দ্রনাথের যে সামান্য বিরোধিতা হয়েছে, এটা বাজে কথা, (এবং সংবাদদাতা রয়টার) বিরোধীরা পরে ক্ষমা চেয়েছে। এলমহার্স্ট প্রকাশ্যে স্বীকারই করছেন না কোনো বিরোধিতা হয়েছে, কিন্তু **Stephen-Hay** কে পরে চিঠিতে জানাবেন (২১ অক্টোবর, ১৯৬৮) কী কী কারণে বিরোধিতা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্তও ছিল।

চীনের নতুন মার্কসিস্টরা রবীন্দ্রবিরোধিতা কেন করেছিল সেটা লিপিবদ্ধ করে **Beijing**-এর দ্বিতীয় বক্তৃতাসভায় ১০ মে বিতরণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন, তাতে কী লেখা আছে। **Dr. Hu-Shih** বলতে চান নি,

পরে কয়েকজন জাপানী রবীন্দ্রনাথকে জানায় লিপিটির মর্ম। লিপিটিতে তরুণরা পাঁচটি কারণে রবীন্দ্রনাথকে চায় না বলে জানায়।

১। প্রাচীন চীন সভ্যতায় জনসাধারণকে পেষণ করা হতো, রাজাদের ধনী করা হতো, মেয়েদের অবমাননা করে পুরুষদের বড়ো করা হতো, অভিজাত সামন্তবর্গ তোষণ করা হতো। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচীন সভ্যতার গুণগান করছেন, অতএব পরিত্যাজ্য।

২। চীনের কৃষি কৃষকদের উদরপূর্তি করতে পারে না, শিল্প কেবল কুটির শিল্প, যানবাহন দিনে কয়েক মাইল মাত্র অতিক্রম করতে পারে, ভাষা এবং লিপি অক্ষম, মুদ্রণশিল্প কাঠখোদাই যুগে পড়ে আছে, রাস্তাঘাট পায়খানা হয়ে পড়ে থাকে, নোংরা রান্নাঘর পৃথিবীজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন আমরা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি।

৩। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন চীনের জয়গান করছেন। সেটা কী ছিল? বিনা কারণে যুদ্ধ, লুঠ এবং ধর্ষণ, মিথ্যে কথা বলা আর ঠকানো, লালসা আর লোভ, নির্লজ্জ বেশ্যাবৃত্তি, গৃধ্নু ধনীদের অত্যাচার, বাপ মাকে খেয়ে পরিয়ে রাখার জন্য ছেলেদের শরীরের মাংস কেটে দেওয়া, পরাজিত সৈন্যের মাথার খুলিতে মদ খেয়ে জয়ীর আহ্লাদ, পা আটকে রেখে মেয়েদের সুন্দর হওয়ার চেষ্টা—এটাকেই রবীন্দ্রনাথ আত্মিক চীন বলে নেচে বেড়াচ্ছেন।

৪। চীনের বর্তমান দুরবস্থার কারণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জনসাধারণের ঔদাসীন্য যার ফলে সামরিক শাসক এবং বিদেশিরা যথেচ্ছ ব্যবহার করার সাহস পাচ্ছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এই সব বিষয়ে আমরা বেশি মাথা ঘামাই। তাঁর মতে, জাতীয়তা বা সরকারের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রত্যেকে নিজের নিজের আত্মার মুক্তির সন্ধান করলেই চলবে। প্রেম, শান্তি ইত্যাদি কথাবার্তা আমাদের দেশকে ধ্বংসের পথে আরো এগিয়ে দেবে।

৫। আমাদের নিজেদের দেশেই ছিল yin আর yang-এর তত্ত্ব তাও-তত্ত্ব, কনফুসিয়স-তত্ত্ব। এখন গজিয়েছে **Harmonious Virtue Society, Spiritual Culture Association**। তার উপর জুটেছে খৃষ্টতত্ত্ব। এখন রবীন্দ্রনাথ শোনাচ্ছেন ব্রহ্মতত্ত্ব। এই সব তত্ত্বের উদ্দেশ্য কর্মহীনতা। যে আধা-সরকারী সমিতি রবীন্দ্রনাথকে ডেকে এনেছে, আমাদের আপত্তি সেই সমিতির বিরুদ্ধেই।

এই হ্যাণ্ডবিলের মর্ম জানার পর রবীন্দ্রনাথ Beijing-এ বক্তৃতাপর্ব অসমাপ্ত রেখে Western Hills-এ চলে যান।

Beijing-এ রবীন্দ্রনাথের যে সাতটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, এবং যার শুরু ৯ মে, তার সবকটিরই মর্ম ছিল আত্মা বনাম যন্ত্র। তৃতীয় দিনের ১২ মে'র বক্তৃতায় তিনি বলেন প্রতীচ্য বিজ্ঞান দিয়েছে, কিন্তু তার অপব্যবহার করেছে, প্রাচ্যও বস্তুতান্ত্রিক ছিল, মুক্তির উপায় হচ্ছে, বিজ্ঞানের বিচার। এই বিষয়টি যদি প্রথম থেকেই তিনি ব্যাখ্যা করতেন তাহলে হয়ত চীনের তরুণরা বিরোধিতা থেকে বিরত থাকত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার অক্ষম অনুবাদ, ইংরেজি ভাষায় চীনের অজ্ঞতা, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত বক্তব্যকে বিকৃত করে দিয়েছিল। এলমহার্স্ট জানিয়েছেন, ২০ এপ্রিল নান্‌কিঙের বক্তৃতায়, তিন হাজার ছাত্রদের মধ্যে চল্লিশ জন রবীন্দ্রনাথের কথা বুঝতে পেরেছিল, এটা রবীন্দ্রনাথই এলমহার্স্টকে বলেছিলেন।

চীন যাত্রার প্রাক্কালে, (এলমহার্স্ট তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন এপ্রিল ১৯২৪), রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তিনি চীনে যাচ্ছেন নতুন চীন বোঝার জন্য, তার ছাত্রদের, অধ্যাপকদের, লেখকদের, চিত্রকরদের, অভিনেতাদের, গায়কদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। প্রাচীন মন্দির ইত্যাদিতে তাঁর মন দেবার সময় হবে না, তার জন্য আছেন তাঁর সহযাত্রীরা।

কিন্তু নতুন চীনের বিরোধিতায় স্তম্ভিত, বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা-পর্বই বন্ধ করে দেন। ফিরে এসে তিনি বলেছিলেন বিরোধীরা সংখ্যায় বেশি নয়, কিন্তু চীনে তাঁর বিরোধীরাই ছিল বেশি এবং মধ্যে মধ্যে তাদের ব্যবহার হয়ে উঠেছিল আতঙ্ককর। যেমন ২৫মে Wuchang মাঠে ছাত্রসভায় বক্তৃতা দেবার সময়। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হলেই দর্শকদের প্রান্তসীমা থেকে শোনা যায়, 'পরাধীন দেশের দাস, ফিরে যাও,' 'আমাদের দর্শন চাই না, আমরা চাই বস্তুতান্ত্রিকতা,' এবং এই মর্মে পতাকা দেখতে থাকে। কালিদাস নাগ দৌড়ে সেদিকে যান, তাঁর ভয় হয়েছিল তাঁরা কবিকে মারবে। (এলমহার্স্টের সঙ্গে কালিদাস নাগের সাক্ষাৎ, নভেম্বর ১৯৫৫)।

কলকাতায় ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, চীনে তাঁর বিরোধীরা তাঁর বক্তৃতার ফলাফল লক্ষ্য করে বিচলিত হয়েছে। সাংহাইয়ে শেষ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, চীনে তিনি কাউকে সমালোচনা করতে আসেন নি, তাঁকেও যেন কেউ সমালোচনা না করে। চীনে অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছে,

সমানে—সমানে কথা বলেছে, এতে তিনি খুশি, দেবতা হয়ে থাকার তাঁর কোনো ইচ্ছা নেই। আরব্যরজনী পড়ে, চীনের বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবি দেখে, জাপান-ভ্রমণের সময় তিনি যে চীনের ছবি মনে-মনে এঁকে রেখেছিলেন, সেই চীন স্বচক্ষে দেখে যেতে পারলেন, এতেই তিনি সন্তুষ্ট। **"Some of your patriots were afraid that, carrying from India spiritual contagion, I might weaken your vigorous faith in money and materialism I assure those who thus feel nervous that I am entirely inoffensive ; I am powerless to impair their career of progress, to hold them back from rushing to the market place to sell the soue in which they do not believe. I can even assure them that I have not convinced a single sceptie that he has a soul or that moral beauty has greater value than material power. I am certain that they will forgive me when they know the result."**

যে ছাত্র ও তরুণদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার আগ্রহ ছিল কবির, সেই কবির হতাশা এখানে স্পষ্টই ফুটে উঠেছে। ছাত্রদের মধ্যে যারা ছিল ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, রোমান্টিক, তারা এবং তরুণ বৌদ্ধরা রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়েছিল। জানায় নি রাজনীতি-সচেতন ছাত্র ও তরুণরা, কুওমিণ্টাঙ এবং কমিউনিস্ট দল নির্বিশেষে। যে সব ছাত্রদের মধ্যে তখনও New Thought Movement এর প্রভাব পৌঁছয়নি, যারা তখনও প্রাচীন চীনের ঐতিহ্যের মধ্যে দেশের মুক্তি খুঁজছিল, তারাও ছিল রবীন্দ্রভক্ত। যারা ছিল দর্শনের ছাত্র তারা আবার ছিল রবীন্দ্রবিরোধী। এই সব ছাত্রদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, মার্কসবাদীরা। Stephen Hay একটি ভোটের কথা বলেছেন এই প্রসঙ্গে ১৯২৩-২৪ সালে, রবীন্দ্রনাথের চীন যাওয়ার প্রাক্কালে। Beijing বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০৭ ছাত্র ও তরুণ ভোট দিয়েছিল : চীনের বাইরে শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? ভোট পড়েছিল এইরকম : লেনিন ২২৭, উইলসন ৫১, বার্ট্রাণ্ড রাসেল ২৪, রবীন্দ্রনাথ ১৭, আইনস্টাইন ১৬, ট্রটস্কি ১২, কাইজার উইলহেলম ১২, ওয়াশিংটন ১১, হার্ডিঙ ১০, লিনকন ৯, জন ডিউই ৯, বিসমার্ক ৯, গান্ধী ৯, টলস্টয় ৭, মার্কস ৬, ইত্যাদি। (ছাত্র বলেই সম্ভবত কে জীবিত আর কে মৃত, এই খেয়াল কারো কারো, ছিল না।

রাজনৈতিক মহলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তৃষ্ণীভাবের একটা বড় কারণ হতে পারে, অজ্ঞতাবশতঃ রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো সাক্ষাৎকারও। শানটুঙে কনফুসিয়াসের সমাধি দেখতে যাওয়া, মাঞ্চু সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সামরিক গভর্ণরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, রবীন্দ্রনাথের ট্রেনের জন্য সামরিক রক্ষী প্রেরণ এবং সর্বোপরে Sun-Yat-Sen-এর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান—ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করে না তোলার কারণ। এলমহার্স্ট ১৯২৩ সালে সান-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, সান উৎসাহিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করতে, বিশ্বভারতীকে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার অজুহাতে রবীন্দ্রনাথ চীনের দক্ষিণে যেতে রাজি হন নি। ক্যান্টনে সানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণ শুরু হলে অন্ততঃ কুওমিন্টাঙপন্থীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ততটা অগ্রাহ্য হতেন না বোধহয়। নবগঠিত কিন্তু জনপ্রিয় এবং অত্যন্ত কর্মমুখর কমিউনিষ্ট পার্টি অবশ্য সাত্ত্বিক প্রতিরোধের আয়োজন করেছিল। সাংহাইতে রবীন্দ্রনাথের অবতরণের পর, ছাত্রদের জন্য, দলীয় সদস্যদের জন্য, এবং দলের মুখপত্র, তিনটি সংবাদপত্রই নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রদর্শনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। মুখপত্রে Oppose Tagore প্রবন্ধে রবীন্দ্র-বিরোধিতার তিনটি কারণ দেখানো হয়: এই ভ্রমণ চীনের পার্থিব অগ্রসরতার পরিপন্থী, প্রেমের বাণী সাম্রাজ্যবাদীদের আরো সুবিধা করে দেবে; প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয়-এর বাণী সমাজের সুখসুবিধার চাইতে ব্যক্তির সুখসুবিধার উদ্বোধক হবে। কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে Beijing এবং Hankow-এ একটি সাময়িক দলও গড়ে উঠেছিল: Drive Away The Elephant Party। রবীন্দ্রনাথকে হাতী বলার উদ্দেশ্য, হাতীর মতো তাঁর দর্শনও বৃহৎ এবং গর্বিত কিন্তু কর্মবিমুখ, বৃহৎ কিন্তু ক্ষুদ্র সহিসের দাস, যখন তখন পা-মুড়ে বসে নির্লজ্জের মতো যাকে তাকে নমস্কার করে, যখন তার চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়, তখনও যন্ত্রণা অনুভব করে না—এতো বৃহৎ অথচ এত নম্র!

রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণ সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি মন্তব্য করেছিলেন, তাঁরা আশা করেছিলেন তাঁরা শুনবেন কবি রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাদের সঙ্গে ঘুরছেন? মাঞ্চু সম্রাট, আমেরিকার অ্যামবাসাডর, অ্যাংলো-অ্যামেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের ব্রিটিশ সভাপতি, জাপানী বৌদ্ধ, এঁরাই কি চীনের লোক? আর Mei Lan-fang কি একমাত্র নট? রবীন্দ্রনাথ কী ধরণের লোক? বিশ্বমৈত্রী সকলের কাম্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

পথে সেই মৈত্রী আসবে না। রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ কমিউনিষ্টদের কাম্য, কিন্তু রাষ্ট্র মানুষকে একত্র করে বলে তার উপযোগিতাও আছে, শৃঙ্খলা আনার আগেই রাষ্ট্রের উচ্ছেদ, যা রবীন্দ্রনাথ চাইছেন, আরো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন বলে কিছু হতে পারে না, সেই অর্থে প্রাচ্য আর প্রতীচ্য বলে কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ যে বলেন প্রতীচ্য মানে কর্ম আর প্রাচ্য মানে বোধ—এ সব কথার কথা। সম্মিলিত হতে হবে জনসাধারণকে, রবীন্দ্রনাথ যদি সেই ঐক্যের কথা না বলেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু শুনতে রাজি নই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এই বিরোধীরা দলে খুব ভারী ছিল না, কিন্তু, সেটা সত্য হলেও তাঁকে কিন্তু Beijing-এ বক্তৃতা বন্ধ করতে হয়েছিল। অজস্র পত্রপত্রিকার ব্যঙ্গবিদ্রূপও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ চীনে আসতে এক হাজার বছর দেরি করে ফেলেছেন। এখন আর বুদ্ধের নাম স্মরণ করে লাভ নেই। এটা তিনি লিখছেন ৭ মে। ৯ মে Beijing-এ প্রথম প্রকাশ্য সভায় রবীন্দ্রনাথ শুরুই করলেন (To the Public at the Theatre in Peking) "Lately I read an observation in one of your papers that, being a philosopher, It was half an hour late in attending a particular meeting. I could satisfactorily explain my conduct if the complaint were restricted to this one casual event but I believe the writer took it as a symbol of some truth about me which was not accidental. I suppose that what gave him more serious concern was that according to him I was altogether out of date in this modern age, that I ought to have born 2000 years ago when poets dreamed over their brimming wine cups in the moonlight and philosophers ignored everything immediate, time and space."

এই দিনই আগেই এক বক্তৃতায় তিনি এটাও বলেছেন, (first Public Talk in Peking)

When I was first invited to come to China, I did not know If all of you wanted a men from India. I even heard some

were opposed to my coming, because it might check your special modern enthusiasm for western progress and force.

আশ্চর্যের কথা, রবীন্দ্রনাথ এই বিরোধিতার কথা জেনেও এবং দেখেও, তেমন জোরের সঙ্গে তার দর্শন-বিবৃতি শুরু করতে চেষ্টা করেন নি, যে চেষ্টা ভয়ংকররূপে দেখা দিয়েছিল দেশে ১৯২১-২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনায়, অসহযোগের বিরুদ্ধে, যেখানে তিনি পাশ্চাত্যের সভ্যতার স্বাঙ্গীকরণের উপর জোর দিচ্ছেন।

যে Mei Lan-Fang-কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কথা শুনতে হয়েছিল, সেই Lan-Fang-এর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা সুখকর হয় নি। তাঁর সেদিনে আয়োজিত চিত্রাঙ্গদার অভিনয়ে Lan-Fang রবীন্দ্রনাথের পাশে বসে রবীন্দ্রনাথের নাটক-বিষয়ে মতামত শুনেছিলেন। ১৯ মে, Beijing-এ চার-সপ্তাহ-ব্যাপী দুঃখকর অভিজ্ঞতার শেষে, Lan-Fong রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর অভিনয়, The Goddess of the Lo River, দেখার জন্য। চীনের প্রথামতো, অজস্র ছোটো-খাটো অভিনয়ের পর, মূল নাটক Goddess আরম্ভ হলো রাত এগারোটায়। ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ নাটকের মাঝখানে উঠে পড়লেন। চীনাদের কাছে এর চাইতে অপমান আর কী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে সে-কথা জানানো হলে রবীন্দ্রনাথ আবার বসেন। কিন্তু স্তম্ভিত Lan-Fang অপমান ভুলতে পারেন নি। মধ্যস্থতা করা হলো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো পরদিন সকালে। সকালে Lan-Fang যেতে অস্বীকার করলেন অসুস্থতার অজুহাতে। অনেক সাধ্যসাধনার পর তিনি এলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নাটক বিষয়ে আলোচনা করলেন।

Lan-Fang-এর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবে, সেটা Stephen Hay জানান নি, তবে কবিতাটি এই :

You are veiled, my beloved,
In a language unknown to me,
Like a hill which seems a cloud
Behind its mask of mists.

কুয়াশার আবরণে পাহাড়কে মেঘ মনে হয়েছিল শুধু Lan-Fang-এর ক্ষেত্রেই নয় হয়ত পুরো চীনদেশটাকেই।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন জন্মদিন স্মরণ করে: "জন্মবাসরের

ঘটে/নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি/করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।" এই কবিতায় তিনি চীনকে স্মরণ করেছেন। স্মরণটি আকস্মিক নয়। চীন থেকে তাও-চী-তাই-এসেছেন, তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখাচ্ছেন ১৯২৪ সালে চীনের দেওয়া দুটো জামা, তিনি জানাচ্ছেন, "চীনদেশে তিনি যেন এক আধ্যাত্মিক নবজন্মলাভ করিয়াছিলেন, এই নববাস সেই নব-জন্মেরই প্রতীকরূপে তাঁহার নিকট আজও সমাদৃত"। তাইকে তিনি জানাচ্ছেন চীনের দীর্ঘ দিবসের সৌজন্যধারার আনন্দময় স্পর্শের অনুভূতি।" (রবীন্দ্রনাথ ও তাই-চী-তাও সংবাদ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, পৌষ ১৩৪৭ প্রবাসী)।

যে আনন্দময় অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল তার একটি নিশ্চয়ই Beijing-এ তাঁর জন্মদিন পালন। Beijing Normal University-তে সদ্যগঠিত Crescent Moon Society উদ্যোগে রাজধানীর চারশো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অতিথি হয়ে এসেছিলেন। Liang-ichao উপহার দিলেন রবীন্দ্রনাথের চীনালিপিতে নতুন নাম খোদাই করে পাথরের ফলক। লিপিটির জন্য প্রথাগতভাবে না নিয়ে লিয়াং নিয়েছিলেন তিনটি অক্ষর, যার একটির অর্থ বাঁশ, প্রাচীন ভারতের প্রতীক, একটি বাজ, একটি উষা, বৌদ্ধলিপিতে যে দুটো অক্ষর প্রাচীন চীনের প্রতীক। শেষ দুটি অক্ষরে রবি+ইন্দ্র (উষা+বজ্র) প্রকাশিত হয়েছে। নতুন নাম দাঁড়াল : চু চেন-তাজ (বাঁশ, বাজ, উষা)। Dr. Hu Shih লিয়াঙের বক্তৃতা ইংরেজি করে শোনালেন, নিজের লেখা একটি কবিতা কাপড়ে লিখে উপহার দিলেন। এর পরে এল ফুল, ছবি। ক্ষিতিমোহন সেন সংস্কৃত স্তোত্র পড়ে শোনালেন, কালিদাস নাগ বলাকা থেকে পাঠ করলেন, নন্দলাল বসু ছবি উপহার দিলেন। চিত্রাঙ্গদার অভিনয় হলো, অংশ নিলেন Miss Lin এবং Xu Zhimo।

এই উৎসব স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ১৯৪১ সালের কবিতাটিতে : "একদা গিয়েছি চিন দেশে/অচেনা যাহারা/ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' ব'লে। /খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ ; /দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ ; /অভাবিত পরিচয়ে/আনন্দের বাঁধ দিল খুলে। /ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস/এ কথা বুঝিনু মনে,/যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে। /আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।"

যে নবজন্মের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখছেন এবং বলছেন তাও-চী-তাইকে, তার কোন পরিচয় আমরা পাই নি চীন-ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথের লেখায়। চীন-

ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ কোনো গান লেখেন নি, উল্লেখযোগ্য চিঠি লেখেন নি, দেশে ফিরে এসে দুতিন মাসের মধ্যেই যাত্রা করেছেন চিলি অভিমুখে। চীনভ্রমণ স্মরণ করে শুধু লিখছেন (যাত্রী) 'কিছুদিন আগে চীন থেকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিল। সেখানকার লোকে আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছিল —কোনো পাকা কথা। অর্থাৎ সে নিমন্ত্রণ প্রবীণকে নিমন্ত্রণ। Stephen Hay-ও লক্ষ্য করেছেন, চীন থেকে রবীন্দ্রনাথ কিছু শিখতে চান নি, শুধুই ভারতের বা এশিয়ার বা প্রাচ্যের বানী শুনিয়েছেন, চীন থেকে কিছু গ্রহণ করেন নি। পরবর্তী কালে তিনি মধ্যেমধ্যেই জাপানী ছবি, বালির নাচের কথা স্মরণ করবেন, কিন্তু চীনের শিল্পকলা সম্পর্কে তিনি প্রায় নিঃশব্দ।

চীন-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে চা-চক্র উদ্বোধন করে শুধুই লিখবেন সুসীম চা-চক্র? এই Sushima (Xu Zhimo)-কেই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন Talks in China গ্রন্থটি। জাভা আর বালি যাওয়ার পথে, ১৯২৭ সালে, সিঙাপুরে এসেও, বা ১৯২৯ সালে জাপান এবং কানাডায় যাওয়ার পথে দুদিনের জন্য সাংহাইতে থেকেও, চীনদর্শনে তিনি আর তেমন আগ্রহ দেখান নি। সাংহাইতে কুওমিন্টাঙ সরকার ১৯২৯ সালে তাকে কোনো উৎসাহ দেয় নি বক্তৃতা করার, বরং যাতে রবীন্দ্রনাথ চীনে কোনো বক্তৃতা না দেন তার দিকে নজর রেখেছিল। আধ্যাত্মিক রবীন্দ্রনাথকে তখন কুওমিন্টাঙের কাছে কাল মার্কসের মতোই ভয়ংকর মনে হয়েছিল, অবশ্য ভিন্ন অর্থে। সাংহাইতে এসে অবশ্য দেখা করেছিলেন Xu Zhimo এবং Hu Shih।

রবীন্দ্রনাথ সাংহাইতে যখন প্রথম আসেন চীনভ্রমণ উপলক্ষ্যে, তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন চীনের খ্যাতনামা তরুণ কবি Xu Zhimo, প্রবীণ দার্শনিক Zhang Jumai এবং প্রবীণতর পণ্ডিত Liang ichao। এঁদেরই সমিতি রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানিয়েছিলেন চীনভ্রমণে। তিনজনই পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিতে দীক্ষিত। Zhang-এর প্রাসাদ-চত্বরে প্রথম মিলনসভায়, সাংহাইতে, Xu আশা প্রকাশ করেছিলেন, নাস্তিকতার গহ্বর থেকে রবীন্দ্রনাথ চীনবাসীদের উদ্ধারের পথ দেখাবেন। জনসভাতে Xu ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুবাদক। Beijing-এ বক্তৃতাসভায় প্রতিবাদের প্রতিরোধে ক্ষুব্ধ Xu রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আবেগময়ী ভাষণ দেন। সেই দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন, কেননা তিনিই রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের সমিতির পক্ষে, জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোনো লেখক সমস্ত চীনে এইরকম প্রভাববিস্তার

করেন নি। রবীন্দ্রনাথকে চীনবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনি বলেছিলেন: হুইটম্যানের কল্পনা ও সহানুভূতি, টলস্টয়ের বিশ্বপ্রেম, মিকেলেঞ্জেলোর দুর্মর ইচ্ছা ও শিল্পপ্রতিভা, সক্রেটিস এবং লাও-সে'র জ্ঞান ও রসবোধ, গ্যোটের শান্তি ও সৌন্দর্য—এই সবের সমন্বয় রবীন্দ্রনাথ, পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

দর্শন নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল চীনে, রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণের প্রাক্কালে, তার এক প্রান্তে ছিলেন Zhang, অপরপ্রান্তে মার্কসবাদীরা। রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে Zhang এর পূর্বপরিচয় ছিল না, কিন্তু সন্দেহ করা হচ্ছিল দলভারি করার জন্যই Zhang রবীন্দ্রনাথকে চীনে আনার বন্দোবস্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চীনের বক্তৃতা শোনার পর Zhang জানালেন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের কোনো মিল নেই, তবে প্রেম ও সৌভ্রাত্রের পূজারী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত আতঙ্ক কেন, তা তাঁর অবোধ্য। Stephen Hay-কে চাঙ জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চীনের বক্তৃতা চীনের বিদ্বজ্জনের উপর কোনো রেখাপাত করে নি, কেননা এতই অস্পষ্ট ছিল তাঁর দর্শন। এদিকে, নয়া-কনফুসিয়াসবাদের প্রবক্তা বলে চাঙ এবং তাঁর অতিথি রবীন্দ্রনাথ নবীন চীনাদের কাছে সন্দেহ-ভাজন হয়ে উঠেছিলেন।

চাঙ-এরও গুরু ছিলেন Liang Qichao। তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য, জাতীয়তাবাদী, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ-গুণের সমন্বয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত, এবং রবীন্দ্রনাথকে চীনে আনায় উৎসাহী। Throne Hale of Imperial Splendour-এ সভায় তিনিই রবীন্দ্রনাথকে স্বাগতসম্ভাষণ জানান, National Normal University-তেও তিনি অভ্যর্থনা জানান রবীন্দ্রনাথকে, জন্মদিনের উৎসবে উপস্থিত থাকেন, Beijing-এর প্রথম জনসভায় রবীন্দ্রনাথকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন। কনফুসিয়াস আর বুদ্ধের বাণীর সমন্বয়, যা ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রব্যাখ্যায় লিয়াঙের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ যখন ভাবছিলেন পৃথিবীর কথা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংহতি, চিয়াঙের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেবলই চীনের কথা।

বিদেশ প্রত্যাগত অপর যে তরুণ বিদ্বান রবীন্দ্রনাথকে সাহচর্য দিয়েছিলেন সেই Dr. Hu Shih শিক্ষাজগতে কনফুসিয়াসের পুরণো গণ্ডী থেকে চীনকে উন্মুক্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি অবশ্য প্রাচীন ঐতিহ্যের নির্মূল করার সাধনায় ছিলেন না, তাঁরও ছিল সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। Beijing-এর যে

জনসভায় প্রতিবাদের ঝড় উঠবে আশঙ্কা হয়েছিল সেই ১০ মে সভাতে Liany-এর ভয় পেয়ে Hu-কে বলেছিলেন সভাপতিত্ব করতে, যাতে তরুণ শ্রোতারা অশান্ত না হয়ে ওঠে। ১২ মে সভাতেও Dr. Shih অনুরোধ জানান যেন শ্রোতারা রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করেন।

যে সব দার্শনিক এবং পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন, তাঁরাও রবীন্দ্রনদর্শনকে গ্রহণ করেন নি। Ku Hung ming এবং Liang Shuming কনফুসিয়াসবাদের পুনরুজ্জীবনে উৎসাহী, Liang Qichao এবং Tai Xu চীনা বৌদ্ধধর্মের। Tai Xu রবীন্দ্রদর্শন শুনে সন্তুষ্ট হন নি, বুদ্ধকে স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ হন নি কেন, এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। Dr. Hu Shih-ও প্রাচ্য আধ্যাত্মিক আর প্রতীচ্য বস্তুবাদী, রবীন্দ্রনাথের এই সরলীকরণ স্বীকার করে নেন নি।

সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রন্থে চীন থেকে রচনা পাঠিয়েছিলেন ping-Hsin (Hsieh Ping-Hsin)। রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণের সময় তিনি ছিলেন ওয়েলেসলি-তে। লক্ষণীয় ১৯৬১ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণ নিয়ে বিশেষ মন্তব্য করেন নি। আরো লক্ষণীয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনার সময় বেছে নিয়েছেন দেশাত্মবোধক কবিতা শ্রমজীবীদের উপর কবিতা ; (Roll of Gitonjali. 43 of Poems, 38 of Poem, 108 of Poems), সেগুচির কাছে চিঠি ইত্যাদির। অধ্যাত্মিক রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সম্পর্কে ১৯২৪-এর তরুণদের আপত্তি ছিল, তাঁর সম্পর্কে ping-Hsin কোন আলোচনাতে যান নি, তৎকালীন প্রতিবাদেরও কোনো উল্লেখ করেন নি। এটাও মনে করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী যাঁরা ছিলেন তৎকালীন চীনে, তাঁরা সবাই ছিলেন পশ্চিমে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহিত্যিক এবং দার্শনিক, কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে কমই ছিল যারা ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ পড়তে পারত।

তাই-চী-তাও শান্তিনিকেতনে আসার পর রবীন্দ্রনাথ ৭ পৌষ উৎসবের বক্তৃতায়, আরোগ্য (মাঘ ১৩৪৭ প্রবাসী) আবার চীনের কথা স্মরণ করলেন এবং বললেন, বরঞ্চ লড়াই করাকে তারা বর্বরতা বলে জ্ঞান করেছে। চীন তার প্রধান দৃষ্টান্ত। চীনের প্রাচীন ইতিহাস ভুলে গেলেও রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিল আধুনিক চীনের সামরিক শাসকদের নিরবচ্ছিন্ন আত্মঘাতী সংঘর্ষ এবং কমিউনিস্ট কুওমিন্টাঙ সংগ্রাম। বাস্তব ইতিহাস অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথ এখনও তাঁর

কল্পনার চীনে বাস করছেন। কমিউনিস্ট-কুওমিন্টাঙ সংগ্রাম তাঁর ভালোই জানা উচিত ছিল। তান উয়ান-শান ছিলেন Mao Zedong-এর সহপাঠী। রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের সময় তান ছিলেন হুনান প্রদেশে। ১৯২৭ সালে সিঙ্গাপুরে তিনি দেখা করেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, শান্তিনিকেতনে আসার নিমন্ত্রণ পান। তিন বছর তিনি থাকেন শান্তিনিকেতনে, তিন বছর চীনে, তারপর ১৯৩৪ সালে তিনি আবার আসেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর উদ্যোগে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে, প্রতিষ্ঠিত হয় Sino-Indian Cultural Society, সরকারী সহায়তায়, নানকিঙে। এই সরকার অবশ্য কুওমিন্টাঙ সরকার। রবীন্দ্রনাথ তখনও ভেবে চলেছেন এবং ১৯৪১ সালেও ভাবছেন, তাই-চী-তাও-এর সঙ্গে কথাবার্তায়, যে চীনের অধিনেতা বীর চিয়াঙ কাইশেক। কিন্তু চীনে কমিউনিস্টদের অবস্থান তাঁর অজানা নয়। তান ১৯৩৪ সালে যখন চীনে যাচ্ছেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলছেন "And tell your young people that they should no blindly imitate the USSR. You have your own Communism. You know that I have a great admiration for the USSR but if you imitate blindly you will get no benefit but disadvantage."

১৯৩৮ অক্টোবর যখন রবীন্দ্রনাথ নোগুচির চিঠির জবাব দেন, তখনও লিখেছিলেন, "যদি আপনার দেশে দরিদ্রদিগকে শোষণ করা না হয় এবং শ্রমজীবীগণ মনে করে যে তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা হইলে আপনার 'কমিউনিজম জুজু'কে ভয় করিবার কারণ নাই।"

তবে শান্তিনিকেতনে চীন-ভবন স্থাপন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে-চীনের যোগাযোগ সেটা চিয়াঙ কাইশেকের যোগাযোগ। চীন-ভবন উদ্বোধনের জন্য রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে যে চিঠি দেন তাতে তিনি জানান, চিয়াঙ কাইশেক এই সাংস্কৃতিক সমিতির সংগঠক।

যে এশিয়ার বাণী রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন ১৯২৪ সালে চীনে, এবং ভারতবর্ষে ফিরে একে জানিয়েছিলেন এই এশিয়া রাজনৈতিক এশিয়া নয়, সেই এশিয়ার নামেই নোগুচির জাপান চীন আক্রমণ করছে, সেই এশিয়ার নামেই চিয়াঙ কাইশেকের চীন মাও নেদঙের চীনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তাঁর বাণীর অপপ্রচারেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচ্যে' আস্থা হারান নি, তাঁর আশা 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ প্রাচ্যই নতুন পথ দেখাবে।

রবীন্দ্রনাথ কি নিজেও জানতেন না তাঁর আশা অবাস্তব স্বপ্ন? ১৮মে

১৯২৪, True Light Theatre-এ জনসভা বাতিল করে দেবার পর National Peking University-তে চায়ের আসরে তিনি বলেছিলেন,

But in the depth of my heart there is pain,—I have not been serious enough. I have had no opportunity to be intensely, desperately serious about your most serious problem. I have been pleasant, nice, superficial. I have followed the spirit of the time which is also easy and superficial, when I ought to have come as one making penance, to take up the heart of life, to prove that I was sincere, not merely literary and poetical.

চীনে ভ্রমণসূচী

কলকাতা থেকে জাপানী জাহাজ, Atsuta Mery, ছাড়ে ২১ মার্চ ১৯২৪। সঙ্গে আছেন কালিদাস নাগ, লেওনার্ড এলমহার্স্ট, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু।

রেঙ্গুন। রেঙ্গুনপ্রবাসী চীনাদের সংবর্ধনা, চীনা বিদ্যালয়ে।

রেঙ্গুন-হংকং। দু সপ্তাহের জাহাজযাত্রা। এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথকে Lao Sho পড়তে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ লাওসে'র সঙ্গে উপনিষদের সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন।

হংকং। Sun Yatsen-এর কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাখ্যান। University of Amoy-এর উপাচার্যের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার নিমন্ত্রণ। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাখ্যান, সময়াভাবে।

সাংহাই। ১২ এপ্রিল। সমবেত জনতা এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা। শহরের সীমান্তে ভাঙা বুদ্ধমন্দির দর্শন।

১৩ এপ্রিল। শতাধিক অধ্যাপক ও ছাত্রের কাছে প্রথম বক্তৃতা। First Talk at Shanghai (Talks in China, প্রথম সংস্করণ)।

১৪ এপ্রিল। ট্রেনে Hangchow।

১৫ এপ্রিল। কয়েক হাজার ছাত্রের সমাবেশে বক্তৃতা:

To Students at Hangchow (TC)

১৬ এপ্রিল। সাংহাই প্রত্যাবর্তন।

১৭ এপ্রিল। জাপানী বিদ্যালয়ে ভাষণ। (প্রকাশক)

১৮ এপ্রিল। Commercial Press সভাগৃহে ১২০০ শ্রোতার কাছে বক্তৃতা। চিত্রশালা, সংগীত সভা, নাটক।

নানকিং। ২০ এপ্রিল। জাহাজে Nanking। General Chi Hsieh-ynan-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

National Southeastern University-তে সহস্রাধিক ছাত্র সমাবেশ। To Students at Nanking (TC)

২১ এপ্রিল। Blue Express luxury train-এ সংরক্ষিত কামরা। ট্রেনে Chü-fu। কনফুসিয়াসের সমাধি দর্শন।

২২ এপ্রিল। Tsinan, Shantung-এর রাজধানী। Provincial Counry Hall-এ কয়েক হাজার ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা। Materialism and Spiritual life, Shantung Christian University-তে দুইশত শ্রোতার কাছে বক্তৃতা।

২৩ এপ্রিল। Beijing। ফুল ও বাজি সহযোগে স্টেশনে সংবর্ধনা।

২৫ এপ্রিল: Anglo Association-এ বক্তৃতা।

Throne Hall of Imperial Splendour-এ সংবর্ধনা। Liang Qichao এর বক্তৃতা: The Kinship between Indian and Chinese Culture। রবীন্দ্রনাথের উত্তর: To the Boys and girls at Pei Hei, Peking (Talks in China তে এই শীর্ষনাম অবশ্যই ভ্রান্ত)।

২৬ এপ্রিল। National Normal University-তে সহস্রাধিক ছাত্রের সমাবেশ। Liang-এর সংবর্ধনাভাষণ।

২৭ এপ্রিল। Young Men's Buddhist Association-এর উদ্যোগে Temple of the Origin of the Law-এ সভা: At a Buddhist Temple, Peking (TC)।

Shen Wu Men (Gate of Divine Military genius)-এ ভূতপূর্ব সম্রাট, ১৮ বছর বয়স্ক, P'u-'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

Navy Club-এ বিদ্বজ্জনসভা। At the Scholars' Dinner, Peking: Mr. Lin। Reply to the Scholars। (TC)

২৮ এপ্রিল। Hsien Nung-tan (Altar of Agriculture)-এ দশ হাজার তরুণ সমাবেশে বক্তৃতা। TC Scholars at the Temple of the Earth। Peking (Tc)

২৯ এপ্রিল। এশীয় সংস্কৃতির দুই গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে বৈঠক।

Tsing Hua College। সংবর্ধনা। সপ্তাহকাল বিশ্রাম।

১ মে। ছাত্রসভা : To Students at Tsing Hua College, Peking (TC)

৫ মে। Beijing প্রত্যাবর্তন।

৬ মে। Dr. Hu Shi-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

Yenching, University Women's Callege-এ ভোজসভা। To the English Teachers' Association, peking (Tc)

Miss Lin-উদ্দেশে কবিতা।

৮ মে। Crescent Moon Society-এর উদ্যোগে জন্মদিন পালন। Beijing House-এ বক্তৃতা। Beijing Normal University-তে বিশিষ্ট জনসভা। Chiang-এর রবীন্দ্রনাথের চীনা নামকরণ। চিত্রাঙ্গদার অভিনয়, অংশ নেন Miss Lin এবং Xu Zhimo। রবীন্দ্রনাথ নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৯ মে। True Light Theatre (Chen kuang)-এ প্রথম জনসভা। First Public Talk in Peking। To the Public at the Theatre in Peking। (TC)

১০ মে। True Light Theatre। দুই দিনের জন্য লেখা দুটো প্রবন্ধ এক সঙ্গে পাঠ : The Rule of giant and এবং giant Killer।

১২ মে : True Light Theatre-এ চতুর্থ বক্তৃতা। Judgement (Visva-Bharati Quarterly 1925 October)

বাকি তিনটি বক্তৃতা বাতিল

১৩ মে : Leo Karakhan-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৪-১৮ মে : Western Hills-এ বিশ্রাম।

১৮ মে : National Peking University-এ ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা। To a Surprise gathering of students in the National

University, Peking। (TC) চায়ের আসর। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। Hu Shih-এর প্রত্যভিভাষণ। The National University. Peking এবং Dr. Hu Shih (TC).

১৯ মে। সহযোগীদের সঙ্গে আলাপ। এবং Reply from Dr.Hushih (TC)

True Light Theatre—এ শেষ ভাষণ। Religious Experience।

The Goddess of the Lo River নাটক দর্শন।

২০ মে। Mei Lan-fang-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ট্রেনে Taiyuan যাত্রা, যেখানে যাবার আমন্ত্রণ আসে Shansi Provincial Education Association-এর পক্ষ থেকে।

General Yen Hsi-Shan-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

Confucian Hall of Self-Examination-এ তিন হাজার শ্রোতার সমাবেশ। 'সন্ন্যাসী' নাটক অভিনয়।

২৫ মে। হ্যাঙকাও। Supporting Virtue Middle School-এ বক্তৃতা। Wuchang মাঠে বক্তৃতা।

২৫-২৭ মে। জাহাজে সাংহাই অভিমুখে।

২৮ মে। সাংহাই। কথাবার্তা : Ast Mr. Bena's। Shanghai (TC)

২৯ মে। Has Ken Road-এ জাপানী বিদ্যালয়ে ভাষণ।

Chang Chun-mai-এর প্রাঙ্গণে সংবর্ধনা। farewell speech at Shanghai (TC)

৩০ মে। সাংহাই ত্যাগ, জাপানের পথে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজকের পৃথিবী ও জনসংযোগ

প্রদীপচন্দ্র বসু

॥ ১ ॥

সেই পুরোনো গল্পটা দিয়েই শুরু করি। মর্ত্যের মায়া কাটিয়ে স্বর্গে চলেছেন এক পুণ্যাত্মা। সঙ্গে পথপ্রদর্শক ও গাইডের কাজ করছে যমদূত। সব স্বর্গবাসীকেই স্বর্গে যাবার আগে একবার নরক দর্শন করে যেতে হয়। নিয়ম মানতে যমদূতের সঙ্গে সেই পুণ্যাত্মাও এসে দাঁড়ালেন নরকের প্রবেশ পথের সামনে। মর্ত্যে থাকতে, অন্য সবার মত, নরক সম্পর্কে তারও একটা ভয়ার্ত ধারণা ছিল। কিন্তু প্রকৃত নরকের সামনে গিয়ে সেদিন যে ছবিটা তিনি দেখলেন তা অন্যরকম। কোথায় গণগণে আঁচে কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে পৃথিবীর পাপী-তাপী মানুষকে জ্যান্ত ভাজা হবে, যমরাজের জহ্লাদরা অমানুষিক অত্যাচার করবে ঈশ্বরের আদালতে সাব্যস্ত দোষীদের ওপর, তা না, দিব্যি নাচগান খানা পিনা হচ্ছে নরকের ভেতর। যেন ফূর্তির হাট বসেছে নরকে, আমোদ প্রমোদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে সবাই। এ দৃশ্য দেখেতো সেই পুণ্যাত্মার চোখ ছানাবড়া। যমদূতকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, নরক সম্পর্কে মর্ত্যবাসীদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে! আসলে নরক অতো খারাপ জায়গা নয়। নরকের চেহারা দেখে আর যমদূতের মুখে সব শুনে পুণ্যাত্মার মনের ভেতর সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। ভাবলেন, নরকেই যদি এত সুখ তবে স্বর্গে যাবার দরকার কি? স্বর্গলাভের আশায় সব ভোগবাসনা ত্যাগ করে মর্ত্যে একেবারে নিরামিষ জীবনযাপন করতে হয়েছে। মর্ত্যের চরিতার্থ না করা লোভ এবার তাকে পেয়ে বসলো। লোভের শিকার হয়ে তিনি স্বর্গের বদলে স্বেচ্ছায় নরকবাস মেনে

নিলেন। আর, তারপরই শুরু হল নরকযন্ত্রণা ভোগ। স্বর্গে যাবার রাস্তা তখন বন্ধ। অতএব ভুলের মাশুল দিতেই হবে। কিছুদিন পর যমরাজ নরক পরিদর্শনে এলে তিনি দেখা করে খুলে বললেন সব। জিজ্ঞেস করলেন, নরকের বাইরের মহল আর অন্দর মহলের দুরকম চেহারা কেন? উত্তরে যমরাজ বললেন, নরক নিয়ে মর্ত্যের লোকের ভীতি থাকায় সবাই পুণ্যকর্ম করে স্বর্গে যেতে চায়। ফলে স্বর্গে স্থান সংকুলান দিনে দিনে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সেজন্য নরক সম্পর্কে মর্ত্যবাসীর মনে ভাল ধারণা তৈরী করতে তিনি বিশেষ জনসংযোগের ব্যবস্থা করেছেন। জনসংযোগের মাধ্যমে তিনি সবাইকে নরকবাসে আগ্রহী করে তুলতে চান।

গল্পটা পড়ার পর বা আগে যারা শুনেছেন, সকলের মনে জনসংযোগ নিয়ে একটা বিপরীত ধারণা স্বভাবতই তৈরী হতে পারে। জনসংযোগ আসলে কি এবং কেন সে বিষয়ে পরে আলোচনা করছি। আপাতত পাঠককে অনুরোধ, জনসংযোগের বিশাল প্রভাব এবং এর দ্বারা কিভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় তা উপলব্ধি করতে। জনসংযোগ নিয়ে আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, 'যে কোন কাজে জনসাধারণের মানসিক সমর্থন থাকা অত্যন্ত জরুরী। জনগণের সমর্থন থাকলে কোন কাজই ব্যর্থ হয় না। না থাকলে সফলও হয় না কিছু।' এক্ষেত্রে বলার বিষয়, জনসংযোগ আর প্রচার এক কাজ নয়। প্রচার জনসংযোগের মাধ্যম। নিছক প্রচারের জন্য প্রচার করলে কখনো তার উদ্দেশ্য সফল হয় না। অন্যদিকে জনসংযোগ হচ্ছে এমন একটি কাজ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ সাধনে যা প্রচারের সাহায্যে করা হয়। এই কাজের পেছনে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে থাকে জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং জনগণের মানসিকতায়, কাজেকর্মে ও আচারে-ব্যবহারে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আনা, যে পরিবর্তন তাদের ভাল বই খারাপ করবে না। অবশ্য জনসংযোগের পুঁথিগত সংজ্ঞা অনেক আছে। এর মধ্যে, কোন সরকার, সংস্থা বা ব্যক্তির সঙ্গে জনগণের সুসম্পর্ক স্থাপন করা অন্যতম। এই মুহূর্তে এয়ার-ইণ্ডিয়ার একটা হোর্ডিংয়ের ক্যাপশান মনে পড়ছে। বছর দেড়েক আগে বোম্বাইতে দেখেছিলাম হোর্ডিংটা। ওতে লেখা ছিল, 'পাবলিক ইজ মাই রিলেশন'। বাংলায় জনগণ আমার আত্মীয়। বাস্তবে জনসংযোগ বা পাবলিক রিলেশানের এটাই গোড়ার কথা। এই বিচারে, জনসংযোগের আসল দরকার, জনসাধারণের মনে আস্থা ও বিশ্বাস উৎপাদন করা, তাঁদের চিন্তাভাবনায় একতা আনা এবং সাধারণ মানুষের

জীবনের মান উন্নয়নের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাওয়ার প্রচেষ্টার চেষ্টা। প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া প্রকৃত জনসংযোগ নয়। তবে কখনো কখনো প্রচারের দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণকে অন্ধকারে রাখা হয়। এ জিনিস রাজনীতিতে আকছারই দেখা যায়। প্রচার শক্তিশালী এবং সুপরিকল্পিত হলে এস্কিমোদের দেশেও ফ্রিজ বিক্রী করা সম্ভব। এই অভিমতটি আমেরিকান প্রচারবিদ্‌দের। সব জনসংযোগের কাজেই শক্তিশালী ও সুপরিকল্পিত প্রচার দরকার, কিন্তু উদ্দেশ্য সৎ না হলে একদিন চালাকি ধরা পড়ে যায় এবং শক্তিশালী প্রচারও ব্যর্থ হয়। এভাবে জনসাধারণের মন থেকে একবার বিশ্বাস ও আস্থা হারালে, সহজে তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না। আজকের পৃথিবীতে সব কাজেই জনসংযোগ বিশেষভাবে দরকারী হয়ে পড়েছে। দেশ শাসনের জন্যেই হোক অথবা পণ্য বিক্রী করতেই হোক, সব কাজের সূত্রপাতই হয় জনসংযোগ দিয়ে। যত দিন যাচ্ছে, দেশে দেশে ও মানুষে মানুষে জটিলতা যত বাড়ছে, এই কাজের গুরুত্বও তত বাড়ছে। কেন এই প্রয়োজন, কেন এই গুরুত্ববৃদ্ধি, তা আলোচনার আগে আজকের পৃথিবীর সামগ্রিক অবস্থাটা একবার খতিয়ে দেখা যাক।

॥ ২ ॥

আদিমযুগ থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই এই সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছিল মানুষকে। প্রতিটি সমাজের মধ্যে ছিল ছোট ছোট গোষ্ঠী। সব গোষ্ঠীর চরিত্র এক ছিল না। পরস্পরনির্ভরতাই বিভিন্ন গোষ্ঠীকে রেখেছিল এক সঙ্গে বেঁধে। চিরদিনই পেশা ও পেশী শক্তির জোরে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্ব বা প্রভাব বিস্তার করে রাখতো। সমমনোভাবাপন্ন বেশ কিছু গোষ্ঠীর সমন্বয়ে তৈরী একটি সমাজে যখন কোন গোষ্ঠীর প্রভুত্বে বাড়াবাড়ি দেখা যেত বা একসঙ্গে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত বা পরস্পরনির্ভরতা যখন পরনির্ভরতায় পরিণত হত, বিদ্রোহ দেখা দিত সমাজ ব্যবস্থায়। ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে নতুন পরিবর্তন সূচিত হত সমাজে।

আজকের পৃথিবীতে ঠিক এই ব্যাপারটাই চলছে। আর্থিক, সামরিক ও অন্যান্য শক্তির বিচারে সব দেশের অবস্থা একরকম না হলেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে প্রতিটি দেশই অন্য দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে ভারসাম্য

বজায় রেখে চলতে চায়। যেহেতু এক একটি দেশের প্রয়োজন এক এক ধরণের, বিভিন্ন দেশের সরকার ও অধিবাসীদের মানসিকতা, ধ্যানধারণা ও চাহিদা একনয়, বিভিন্ন দেশের সম্পর্কের মধ্যে সবসময় একটা অবাঞ্ছিত উত্তেজনা ও ক্ষোভ থাকে। উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বর্তমান সম্পর্ককে অনুধাবন করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতির তারতম্যে এই ক্ষোভ বা উত্তেজনা বাড়ে কমে। ওপরে ওপরে শান্তি ও সহাবস্থানের চেষ্টা করলেও বুকের গভীরে ক্ষতের দাগ কোনদিনই মোছে না। পরিস্থিতির আরো অবনতি হয় যখন প্রয়োজনের তাগিদে পরস্পর নির্ভর একাধিক দেশ নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী তৈরী করে অন্য শক্তিশালী দেশগুলির ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে চায়। আবার একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোন দেশের স্বার্থসিদ্ধি না হলে সে গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসে। এভাবে এক গোষ্ঠী ভাঙ্গে, আর এক গোষ্ঠী তৈরী হয়।

সিয়াটো, সেন্টো, ন্যাটো, নাম, কমনওয়েলথ প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশ যদিও জানে একে অপরকে ছাড়া এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, ঘোষণা অনুযায়ী যদিও প্রতিটি দেশই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী, বাস্তবে কিন্তু পৃথিবীর দেশগুলি নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোষ্ঠীর সনদ ভাঙ্গতে বা অন্য দেশকে আক্রমণ করতে একটুও পিছ পা হয় না। পরস্পরনির্ভর হলেও সব দেশই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে খোলাখুলিভাবে বা গোপনে একে অপরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এক গোষ্ঠী লাগে অপর গোষ্ঠীর পিছনে। শক্তিশালী দেশের দুর্বল দেশের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের স্পৃহা আজো অব্যাহত। তবে এখন কোন দেশ অপর দেশের মাটিতে উপনিবেশ স্থাপন করতে চায় না। রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তার করে, দুর্বল দেশগুলিকে পরনির্ভরতার জালে আটকে রেখে, শোষণ করতে ভালবাসে। সাম্যবাদের ভিত্তিতে রচিত পরস্পরনির্ভরতার চুক্তি, পরনির্ভরতা এবং অসাম্যের কালো মেঘকে নিয়ে আসে ডেকে। এরকম পরিস্থিতিতে অনেক দুর্বল দেশের পক্ষেই, রাজনৈতিক বিচারে স্বাধীন হলেও, নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলা সম্ভব হয় না। পরনির্ভরতা দীর্ঘদিনের হলে তা সংস্কৃতি ও জাতীয় চরিত্রেরও ক্ষতি করে যা একটি দেশে ও জাতিকে ধ্বংস করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ফলে অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে এক দেশ অন্য কোন দেশকে পুরোপুরি

বিশ্বাস করে না। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি দেশই গোপনে বা প্রকাশ্যে 'বিগ ব্রাদারদের' খুশী রাখতে চায়। বিগ ব্রাদাররাও এর সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখে। রাজনীতিতে এখন মরালিটি বলে কিছু নেই। অথচ মুখে সবাই বলে, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা অন্যায় রাজনৈতিক বিচারে তা কখনো ন্যায় হতে পারে না। বাস্তবে, মানবিকতাহীন রাজনীতি দেশে দেশে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে হিংসার বীজ। দু'দশক আগেও পৃথিবীর চেহারাটা এত খারাপ ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহ হলেও তার প্রভাব পড়তো একটা সীমিত এলাকায়। কিন্তু আজ পারমাণবিক অস্ত্রধর দুটি দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি চরমে পৌছেছে। ডেমোক্লেসের খাঁড়ার মত মাথার ওপর সবসময় ঝুলছে পরমাণু যুদ্ধের আশংকা। যে কোন মুহূর্তে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে! রাজনৈতিক ঔপনিবেশিকতা না থাকলেও পরমাণু যুদ্ধের আশংকা ও তার সঙ্গে ধনী দেশগুলির অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকসুলভ আচরণ এবং তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর মনোভাব, উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশের জনগণকে কুরে কুরে খাচ্ছে। উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ফারাক বাড়ছে প্রতিদিন।

মানুষের পৃথিবীতে এত বৈষম্য কেন? কেন এত অবিশ্বাস? মৃত্যুভয়ে ভীত কেন প্রতিটি মানুষ? বিশেষজ্ঞদের মতে প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনে বিপ্লবই এর জন্য দায়ী। মুষ্টিমেয় কয়েকটি উন্নত দেশ এই প্রযুক্তিবিদ্যাকে আয়ত্ত করেছে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে, আর যেসব শিল্পদ্রব্য তৈরীর জন্য এই প্রযুক্তিবিদ্যা তার কাঁচামালের ভাণ্ডার রয়েছে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলিতে ছড়িয়ে। ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক অসম পরস্পরনির্ভরতার আবহাওয়া। গরীব দেশ থেকে অল্পদামে কাঁচামাল কিনে, ওই কাঁচামাল দিয়ে শিল্পদ্রব্য তৈরী করে, ধনী দেশগুলি চড়া দামে আবার ওই গরীব দেশগুলির কাছে বিক্রী করছে। এ ব্যবসা চলছে বহুদিন ধরেই। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ফলে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আর্থিক, বাণিজ্য ও সামরিক শক্তির ফারাক গত তিরিশ বছরে প্রচণ্ড হারে বেড়েছে। সামগ্রিক বিচারে মানবজাতির উন্নয়নের সুফল তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। ১৯৭৮-এর হিসেব অনুযায়ী ওই বছর সারা পৃথিবীতে জি-এন-পি'র পরিমাণ ছিল ৮·৫ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার। এর শতকরা আশি ভাগের দখলদারী করেছে মাত্র কয়েকটি উন্নত দেশ যাদের মোট জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র পঁচিশ শতাংশ। অন্যদিকে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশের মিলিত

পঁচাত্তর শতাংশ মানুষের হাতে ছিল মাত্র কুড়ি শতাংশ জি-এন-পি। উন্নত দেশে যেখানে মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয় ছিল ৩০০০ ডলার, উন্নয়নশীল দেশে তা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৫০০ ডলারে। গরীব দেশগুলির কোটি কোটি মানুষ ওই বছর মাথাপিছু ২০০ ডলারেরও কম আয় করেছে।

এই অর্থনৈতিক বৈষম্যই সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক বৈষম্য। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উপনিবেশ বজায় রাখার জন্য উন্নত দেশগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড রেষারেষি। উন্নয়নশীল দেশের জনগণের জাতীয়তাবোধ এবং আত্মনির্ভরতার পথে অগ্রগতির সাথে সাথে শিল্পোন্নত দেশগুলির তৈরী বাজার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে বিশ্বের বাজারে দেখা দিয়েছে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। আজকাল অনেক শিল্পোন্নত দেশকেই তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে হাতে পায়ে ধরে পণ্য বিক্রী করতে হয়, নাহলে বন্ধ করে দিতে হবে ওইসব দেশের কলকারখানা। বাস্তবে আজকাল অনেক শিল্পোন্নত দেশেই অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারী বাড়ছে। এছাড়া এই দেশগুলি আরো বুঝতে পারছে যে অনেক শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ভাঁড়ার পৃথিবীতে ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছে। যেমন ফুরিয়ে আসছে মাটির নীচের তেল। সেজন্য সতর্ক ব্যবস্থা হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশে এখনও ওইসব কাঁচামাল আছে, সেই দেশের সঙ্গে সব শিল্পোন্নত দেশই সম্পর্ক ভাল করতে চাইছে। ধনী দেশগুলির মধ্যে ঝগড়াঝাটির এটাও অন্যতম কারণ।

রেষারেষি বা ঝগড়াঝাটি যে কারণেই হোক না কেন, এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু গরীব ও উন্নয়নশীল দেশেরা। শেষোক্ত দেশগুলিতে ঘন ঘন সরকার পাল্টে যাচ্ছে, নিহত হচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা, বর্ষার আবহাওয়ার মত টাকার দাম ওঠানামা করছে, অনাহারে মারা যাচ্ছে কোটি কোটি মানুষ, রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে শিশুরা, বিষাক্ত হচ্ছে পরিবেশ। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার শিকার হচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক। সাধারণ মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার চেয়ে অনেক দেশের সরকারই এখন দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমানা রক্ষায় বেশি ব্যস্ত। অনাহারে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি এবং জনসংখ্যার বিস্ফোরণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে একদম পর্যুদস্ত করে ফেলছে। সাময়িকভাবে সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য এসব দেশেরা বহুদিন ধরেই হাত পাতছে ধনী দেশগুলির কাছে। ধনী দেশ ও তাদের অর্থ

সাহায্যে তৈরি আন্তর্জাতিক ঋণভাণ্ডারগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য ভিক্ষে দেবার মত কিছু কিছু সাহায্য ও প্রায় একতরফা শর্তে ঋণ দিচ্ছে যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এই ঋণ ও সাহায্য শেষোক্ত দেশগুলির ভাল করার চেয়ে সর্বনাশকে তরান্বিত করছে বলা যায়। এক দশক আগের ধনী দেশগুলির কাছে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশের যা ঋণ ছিল বর্তমানে তা প্রায় দশগুণ বেড়েছে। এই গলার ফাঁস অদূর ভবিষ্যতে ছাড়াবার আর কোন উপায় নেই। রপ্তানী বাণিজ্য বাড়ালেও, ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে আমদানীর পরিমাণও বাড়ছে এবং ডেবিট-ক্রেডিটের পর কখনোই দেখা যাচ্ছেনা যে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয় করে ঋণ শোধ করতে সমর্থ হচ্ছে ঋণগ্রহণকারী দেশেরা। এক ঋণ শোধ করে আর এক ঋণ নেবার বদলে ঋণ শোধ করতে আবার ঋণ নিতে হচ্ছে।

ঋণের ফাঁস গলায় চেপে বসা ছাড়াও আরো একভাবে সর্বনাশ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির। 'বিগ ব্রাদারদের' রেষারেষির বীজ ছড়িয়ে পড়ছে এসব দেশের মধ্যে। অকারণে, নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হচ্ছে তারা। অনেক ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির কূটনৈতিক চাল তৃতীয় বিশ্বের দুটি বা তারও বেশি দেশের মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধ। এ ধরণের যুদ্ধ লাগলে অস্ত্র বিক্রী করে ফয়দা তোলে শিল্পোন্নত দেশের ব্যবসায়ীরা। এছাড়া একবার দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ হলে সহজে সম্পর্ক আর স্বাভাবিক হয়না। তখন ভবিষ্যত আক্রমণের আশংকায় ওই দুটি দেশ কেবলই নিজেদের অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে যায়। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেয়ে সামরিক শক্তির উন্নতির দিকেই ওইসব দেশের শাসকরা বেশি মনোনিবেশ করেন। ১৯৮০-র হিসেব অনুযায়ী ধনী দেশগুলি থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশেরা ২০ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। এই অর্থ থেকে ১৮'৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র কিনেছিল সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলি এবং চুক্তি করেছিল আরো ৪১ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কেনার। পৃথিবীর যুদ্ধবাজরা সম্মিলিত ভাবে বর্তমানে প্রতি মিনিটে অস্ত্র তৈরীর জন্য ১'৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করছে। ১৯৮১-তে সারা পৃথিবী জুড়ে সামরিক প্রস্তুতি বাবদ খরচ হয়েছিল মোট ৫২০ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে প্রতিদিন অনাহারে ও অপুষ্টিতে মারা গেছে ৪০,০০০ মানুষ।

শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছে অস্ত্র বিক্রী এখন প্রধান ব্যবসা। একমাত্র আশি দশকেই ইতালী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা বাড়িয়েছে ১০২৩ শতাংশ, জার্মানী ৬৭৮

শতাংশ, ফ্রান্স ৬০৯ শতাংশ, আমেরিকা ৪৫০ শতাংশ, রাশিয়া ২৫১ শতাংশ এবং ব্রিটেন ২৫১ শতাংশ। এইসব দেশ গরীব দেশের জনগণকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত করে নিজেদের কোষাগারকে স্ফীত করেছে। আধুনিক মারণাস্ত্র কিনে অনগ্রসর দেশগুলি যে শুধু পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করছে তাই নয়, শাসনের নামে অনেক দেশের শাসক গোষ্ঠীই এই অস্ত্র নিজ নিজ দেশে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবীকে ঠেকিয়ে রাখতেও ব্যবহার করছে। যে অস্ত্র জন্য দেশের মানুষকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, সেই অস্ত্র বিক্রীর ব্যবসা থেকে বর্তমানে রাশিয়ার রপ্তানি বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশ আয় হয়। এক মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিদেশে বিক্রী হলে আমেরিকায় ৫০,০০০ লোকের চাকরী বজায় থাকে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কমিশন অন ডিস্ আর্মামেণ্ট এণ্ড সিকিউরিটির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এ বছর সারা পৃথিবীতে সামরিক প্রস্তুতির জন্য ব্যয় হবে ৬৫০ বিলিয়ন ডলার যা পৃথিবীর পঞ্চাশটি দরিদ্রতম দেশের ১৫০ কোটি মানুষের মোট বাৎসরিক আয়ের থেকে অনেক অনেক বেশি।

সামরিকখাতে যে পরিমাণ সম্পদ সারা পৃথিবীতে খরচ হয় তা যদি মানুষের সার্বিক উন্নতির কাজে লাগানো যেত তাহলে পৃথিবীর চেহারাটাই এতদিনে অন্যরকম হতো। সামরিক প্রস্তুতির জন্য পৃথিবীতে প্রতিদিন যে টাকা খরচ হয় তা বন্ধ করলে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার যে অর্ধেক প্রতিদিন অভুক্ত থাকে তাদের পেট ভরে খাওয়ানো সম্ভব। অথবা, ওই টাকা দিয়ে সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর যে ১৭০ লক্ষ শিশু খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে অকালে প্রাণ হারায়, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারতো ভাগ্যহীন পিতা মাতারা। পৃথিবীর দশদিনের সামরিক খরচের টাকা একত্রিত করে খাদ্য কিনে দিলে নব্বইটি গরীব দেশে কোন খাদ্যাভাব থাকতো না। একটা এফ-১৬ বিমানের যা দাম তার থেকে অনেক কম খরচে চিকিৎসার অভাবে প্রতিবছর পৃথিবীতে যে ১৭ লক্ষ লোক যক্ষা রোগে মারা যায় তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম আমরা। বর্তমানে পৃথিবীতে মাথা পিছু উৎপাদিত হয় তিন টন বিস্ফোরক এবং আধ আউন্স ওষুধ। একটা ট্রাইডেণ্ট সাবমেরিন বানাবার টাকা শিক্ষাখাতে খরচ করলে ১ কোটি ৬০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া যায়। এরকম পঞ্চাশটি সাবমেরিন না বানালে সারা পৃথিবীর ৮১ কোটি মানুষের নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব। এক কোটি হেক্টরেরও বেশি

জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে যদি একটা আই সি বি এম বানানো বন্ধ করে আমেরিকা। সবচেয়ে বিস্ময়ের, মানুষ মারতে সামরিক গবেষণায় বর্তমান পৃথিবীতে খরচের পরিমাণ, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চিকিৎসা গবেষণায় মোট খরচের নয় গুণ বেশি।

॥ ৩ ॥

রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা ছাড়াও আরো কয়েকটি মারাত্মক সমস্যা চোখের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরছে এই সমস্যাগুলি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, যথেচ্ছাচার ও অসতর্কতার। ফল। উন্নত, উন্নয়নশীল, গরীব-সব দেশেই এসব সমস্যা কম বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা এবং এর থেকে উদ্ভব হচ্ছে অন্য সমস্যাগুলি। ১৯৮১-র হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে উন্নয়নশীল ও গরীব দেশগুলিতে আগামী ৩৪ বছরের মাথায় জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হবে। ২০০১-এ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ বাস করবে এইসব দেশে। ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিবছর এই দেশের জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ার বর্তমান জনসংখ্যা।

২০০১ সালে সারা পৃথিবীর মানুষের চার বেলা খাদ্য জোটাতে বর্তমানে পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় তা দ্বিগুণ করতে হবে। এখনই পৃথিবীতে অর্ধেক মানুষ প্রতিদিন অনাহারে ও অর্ধাশনে দিন কাটায়, শতকরা ষাট ভাগ লোক পরিশ্রুত পানীয় জল পায় না। অতএব আরো সতেরো বছর পর পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কপালে কি আছে তা সহজেই অনুমেয়। অন্নজলের সঙ্গে যুক্ত হবে তখন জ্বালানী সংকট। বর্তমানে জ্বালানী ও কাগজ শিল্পের জন্য যে হারে বৃক্ষচ্ছেদন চলছে, তা অব্যাহত থাকলে আগামী দু'দশক পরে পৃথিবীতে অরণ্য বলতে কিছু থাকবে কিনা সন্দেহ! শিল্প ও জ্বালানীর প্রয়োজন ছাড়াও চাষের জমি বাড়াতেও জঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে এখনো! এভাবে একদিকে অরণ্য নিঃশেষে হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে খরা। পাল্টে যাচ্ছে জলবায়ুর চেনা রূপ। ক্রমশ মরুভূমি হতে চলেছে সমস্ত পৃথিবী। হারিয়ে যাচ্ছে অনেক দরকারী উদ্ভিদ চিরদিনের জন্য। আজ একটিও ডোডো পাখী পৃথিবীতে বেঁচে নেই।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে পৃথিবীতে যেসব অধিক ফলনশীল

জাতের চাষ হয় সেগুলির অধিকাংশই বর্ণসংকর জাত। এই জাতগুলি রোগ-পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় সহজেই। ফলে পৃথিবীর সব দেশেই ফসলের চাষে রোগপোকার আক্রমণ বাড়ছে। কীটঘ্ন দিয়ে এখন অবস্থা সামাল দেওয়া হলেও তা কি অনন্তকাল চলতে পারে? এছাড়া এক জমিতে বছরে একাধিকবার চাষ হওয়ায় জমির ওপর চাপ বাড়ছে এবং ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এসব জমির নিজস্ব উৎপাদিকা শক্তি। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে জমির মাটির উর্বরতা সাময়িকভাবে বাড়ানো সম্ভব হলেও তার একটা সীমা আছে। মানুষ ছাড়া গৃহপালিত পশুর খাদ্য জোগাড় করাও বর্তমানে বেশ কঠিন কাজ। ভবিষ্যতে আরো কঠিন হবে। কারণ মানুষের বাসস্থানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে প্রতি বছরই বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পতিত গোচারণ ভূমি হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু পতিত গোচারণ ভূমি কেন, চাষের উর্বর জমিও নষ্ট হচ্ছে। আমেরিকার কৃষি দপ্তরের প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা যায়, ১৯৬৭ থেকে ৭৫—এই নয় বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ২·৫ মিলিয়ন হেক্টর চাষের জমি মনুষ্যবসতি তৈরীর জন্য গ্রাস করা হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০০০ সাল শুধু বাসস্থান তৈরী করতে ২৫ মিলিয়ন হেক্টর চাষের জমিকে মানুষ চিরতরে বন্ধ্যা করে ফেলবে। ওই সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে বর্তমানে পৃথিবীতে যে ৪৩ ভাগ জমি প্রায় নিষ্ফলা তার সাত শতাংশ জুড়ে আছে মানুষের বাড়ীঘর, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি। ২০০০ সালে আমাদের দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি হবে। এই ১০০ কোটি লোকের জন্য মাথার ওপরে ছাদ তৈরী করতে কি বিপুল এলাকা প্রয়োজন হবে এবং শহর ছাড়াও দেশের ৫,৫০,০০০ গ্রাম আয়তনে কিভাবে বাড়বে তা বলা বোধহয় যন্ত্রগণকের পক্ষেও সম্ভব নয়।

অরণ্য নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খরা যেমন বাড়ছে, বন্যার প্রকোপও বাড়ছে পাশাপাশি। অধিক বৃষ্টিপাত এলাকায় বন্যার ফলে প্রাণ, ফসল ও অন্যান্য সম্পদহানি ছাড়াও জলের স্রোতে জমির উপরিভাগের উর্বর মাটির স্তর ধুয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭২-এর সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের দেশে এভাবে ধুয়ে যাওয়া মাটির বাৎসরিক পরিমাণ ৬০০০ কোটি টন। জমির যে উর্বরতা এভাবে নষ্ট হয়, টাকার অঙ্কে তার মূল্য ৭০০ কোটি। এছাড়া ধুয়ে যাওয়া মাটি বুজিয়ে দিচ্ছে নদীর গভীরতা। জল বহন ক্ষমতা কমছে সব নদীর। ফলে বন্যার আশংকা উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি ছাড়া বর্তমানে যে বিশেষ সমস্যাটি সমগ্র পৃথিবীর

মানুষকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে তা হল পরিবেশ দূষণ। পারমাণবিক জঞ্জাল পৃথিবীর পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। শিল্পের বর্জ্যপদার্থ দূষিত করছে পরিবেশ। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার ও কীটঘ্নের পরিবেশের ওপর কুফল। সব মিলিয়ে পৃথিবীর কোথাও এখন নির্মল বাতাস ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর। এই পরিবেশদূষণ নষ্ট করে দিচ্ছে প্রাণী জগতের ভারসাম্য। নিত্যনতুন দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিচ্ছে মানুষের দেহে। পৃথিবী থেকে উপগ্রহের পর উপগ্রহ পাঠিয়ে মানুষ মহাকাশকেও ক্রমশ দূষিত করে ফেলছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এই পরিবেশ দূষণের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। শিল্পোন্নয়ন পরিবেশকে কিভাবে দূষিত করে তা কলকাতা ও হাওড়া শহর দুটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

॥ ৪ ॥

রাজনৈতিক, সামরিক, জনসংখ্যা, খাদ্য, পরিবেশ—সব সমস্যা মিলিয়ে দিনে দিনে পৃথিবী যেভাবে কণ্টকিত হয়ে পড়ছে, অনেকের ধারণা পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যেতে আর বেশি দেরী নেই। পৃথিবী তো ধ্বংস হবে না, লুপ্ত হবে মানব সভ্যতা। অতীতে যেমন হারিয়ে গেছে মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা। পার্থক্য শুধু থাকবে ধ্বংসের কারণে। প্রকৃতির রুদ্ররোষে ধ্বংস হয়েছিল অতীতের জনপদগুলি। আর, ভবিষ্যতে যে ধ্বংসের আশংকা করছেন সবাই তার কারণ হবে মানুষ। যার হাতে গড়া, সেই ভাঙবে সব। বাহ্যিক কারণ হিসাবে হয়ত দায়ী করা হবে পারমাণবিক যুদ্ধ বা অন্য কোন মড়ককে। আবার কেউ কেউ মনে করেন প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের স্বেচ্ছাচার বন্ধ করার জন্য প্রকৃতিই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুমান যাই হোক না কেন তা নিছক অনুমানই। এক্ষেত্রে সত্য শুধু যে পৃথিবীর সমস্যাগুলি ক্রমশ এত জটিল হয়ে পড়ছে যে এখন থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে একদিন তার সমাধান মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই সত্যের ওপর ভিত্তি করেই যত আশংকা আর অনুমান। বাস্তবে আমরা চিরদিনই দেখেছি, সব প্রাণীই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। জন্মলগ্ন থেকে মানুষও তাই করেছে, করছে এবং করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট প্রতিকূলতার সঙ্গে কিভাবে লড়াই করবে মানুষ? কিভাবে বিভিন্ন দেশ ও দেশের মানুষ পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, রেষারেষি ও

যুদ্ধবিগ্রহ ভুলে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকে ভবিষ্যত বংশধরদের কথা ভেবে সুন্দর করে গড়ে তুলবে?

বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন গত চার-পাঁচ দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা যত বেড়েছে, দেশে দেশে ও মানুষে মানুষে ততই বেড়েছে দূরত্ব। কমিউনিকেশন ও কনভেয়েন্সের বৈপ্লবিক অগ্রগতি সময়ের মাপে মানুষকে পরস্পরের খুব কাছে আনলেও, মানসিকতার দিক থেকে পরস্পরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। জীবনের জটিলতা যত বাড়ছে, কমছে মানুষের সহনশীলতা। অন্যদিকে বাড়ছে উত্তেজনা। এক ধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধ ঘিরে ধরছে প্রতিটি মানুষকে। অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি, মানসিকতার দৈন্য তাকে আরো প্রকট করে তুলছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ এই ভুলের শিকার হচ্ছেন। কলকাঠি নাড়ছে সরকার, রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। দুনিয়া জোড়া দাবার ছকে ক্ষমতাসীন লোকেরা সাধারণ মানুষকে বোড়ের মত ব্যবহার করছেন। সাধারণ মানুষের এই দুর্গতি প্রায় সব দেশেই চোখে পড়ে।

সুতরাং এর থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে বর্তমানে যেসব সমস্যা পৃথিবীকে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম দরকার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষকে একসূত্রে বাঁধার। মুছে ফেলতে হবে মানুষের মন থেকে রেষারেষি ও প্রভুত্ব বিস্তারের মনোভাব। যুদ্ধবাজদের অস্ত্র শানানোর প্রচেষ্টারও পরিবর্তন করা দরকার। পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় দিতে হবে অর্থনৈতিক উপনিবেশ স্থাপন এবং তথ্য নিয়ে সাম্রাজবাদী ক্রিয়াকলাপ। আজ যদি অন্য কোন গ্রহের প্রাণী আমাদের এই গ্রহকে আক্রমণ করতো, আমরা যেমন হাতে হাতে মিলিয়ে দেশ স্থান কাল ও চামড়ার রং ভুলে ওই আক্রমণ প্রতিহত করতে লড়াই করতাম, সেভাবেই সব দেশ ও সব মানুষকে একসঙ্গে মিলেমিশে বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। একাজে বিশেষভাবে দরকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা গড়ে তোলার মনোভাব। কারণ অধিকাংশ সমস্যাই কোন দেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় সমাধান করা সম্ভব নয়।

একা বেঁচে থাকতে পারে না বলে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার মনোভাব প্রথম থেকেই আছে। কিন্তু এই মনোভাবকে অতীতে

কলুষিত করেছে মানুষের আসুরিক শক্তি। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, এই ছিল শক্তিশালী দেশগুলির আচরণ। পিছিয়ে থাকা দেশগুলি থেকে সম্পদ গায়ের জোরে আহরণ করেছে শেষোক্ত দেশেরা। বেশির ভাগ দেশই নেবার বেলায় ছিল পরস্পর নির্ভর, দেবার সময় অন্য দেশের প্রয়োজন, সুবিধা-অসুবিধাকে খতিয়ে দেখেনি গুরুত্ব সহকারে। যে যার নিজের স্বার্থ নিয়ে মগ্ন। এ অবস্থা আজো পুরোমাত্রায় বর্তমান। রসায়নে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী স্যার জর্জ পোটারের মতে, পরস্পরনির্ভর হওয়া মানেই পরনির্ভর হওয়া বা স্বাধীনতাহীন হয়ে বেঁচে থাকা নয়। জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষই ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। কোন দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যেও পরস্পরনির্ভরতায় বিশ্বাসী হয়ে তার স্বাধীন মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এ কারণে দরকার আন্তর্জাতিকতা ও স্বাধীনতা—সবের মধ্যেই একটি সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করা। একাজ সম্ভব না হলে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই লক্ষ্যবিচ্যুত হবে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ এল. কে. ঝা-র একটি অভিমত উল্লেখযোগ্য। ব্রান্ট কমিশনের অন্যতম সদস্য ঝা অনেকদিন ধরেই বলছেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সমৃদ্ধি লাভের ওপরই নির্ভর করছে উন্নত দেশগুলির ভবিষ্যত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। প্রথমোক্ত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক মন্দা বাজার সংকুচিত করে ফেললে, উন্নত দেশের শিল্পজাত পণ্য কিনবে কে? আবার উন্নত দেশের শিল্পের বাজার নষ্ট হলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে শিল্পের কাঁচা মাল বিক্রী ব্যাহত হবে। এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, এখন পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে দরকার আন্তর্জাতিক স্তরে একটি সুস্থ বোঝাপড়া, দরকার একটা গ্রহণযোগ্য ভারসাম্য তৈরির প্রচেষ্টার যা একই সঙ্গে সব দেশের আর্থিক অগ্রগতিকে তরান্বিত করবে। এভাবে সব সমস্যার সমাধানেই পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষকে আগে ভাবতে হবে আমরা এই গ্রহের অধিবাসী তারপর রাশিয়া বা আমেরিকা বা নাইজেরিয়ার। পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেলে এককভাবে কোন দেশের অবস্থা কি ভাল থাকতে পারে?

॥ ৫ ॥

আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করে আকাঙ্ক্ষিত ঐক্য আনা ও সৎ পরস্পরনির্ভরতার পরিবেশ

তৈরি করতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ ব্যাপকভাবে জনসংযোগ। প্রতিটি মানুষকে জানানো দরকার এই গ্রহের বর্তমান অবস্থা, তার ভবিষ্যত। কোন শত্রু অস্ত্র শানাচ্ছে আর কে বাড়িয়ে দিচ্ছে বন্ধুত্বের হাত? এই মুহূর্তে তার কি প্রয়োজন এবং আগামীদিনের পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে ব্যক্তিগতভাবে তার করণীয়ই বা কি এটাও ভালভাবে উপলব্ধি করানো দরকার যে তার নিজের দেশের সরকার তাকে ভুলপথে চালিত করছে কিনা? ভাবলে অবাক লাগে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও এখনো মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশের অধিবাসীরা পাশের দেশের মানুষদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন না। এরকম অজ্ঞতা থাকলে ওই সব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য আসবে কি করে? কিভাবেই ওইসব দেশের সরকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগে কমন প্রব্লেমগুলির মোকাবিলা করবেন।

পৃথিবীর যে কোন জটিল সমস্যার সমাধানে জনসংযোগ যে কি বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে তা ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ হওয়া বা ওয়াটার গেট স্ক্যাণ্ডাল থেকে বোঝা যায়। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলি এবং সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা এক্ষেত্রে জনসংযোগের কাজ করেছে। জনগণের সমর্থন না থাকার জন্য আমেরিকার সরকারকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে হল। সাধারণ মানুষ কেলেঙ্কারীর কথা জানতে পারায় প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে নিক্সনকে। এই সাধারণ মানুষই গত কয়েক মাস ধরে ইউরোপ ও আমেরিকার রাস্তায় পরমাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমাবেশ ও মিছিল করছেন। পরমাণু বোমার খাদ্য হতে সবারই আপত্তি। দেশ স্থান কাল ভিন্ন হলেও ওই সমাবেশ ও মিছিলগুলিতে বিভিন্ন বয়সের মানুষ, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবার হাতে ছিল একই ধরণের পোস্টার এবং কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে একই অর্থবহনকারী শ্লোগান। পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমগুলি সোচ্চার হয়ে ওইসব দেশের জনসাধারণকে অবহিত করে তোলার ফলেই পরমাণু যুদ্ধ বিরোধী এই আন্দোলনের দানা বাঁধা সম্ভব হয়েছে। আবার এই সমাবেশ ও মিছিলের খবর জনসংযোগের মাধ্যম মারফত অন্য দেশের অধিবাসীরা জানতে পারায়, সে সব দেশের জনবিবেকও সোচ্চার হয়ে উঠেছে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধে।

পরমাণু যুদ্ধ বিরোধী এই আন্দোলন সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে আরো একটি সচেতনতা আনছে। আর তা হলো এই পৃথিবীকে গড়ে তুলতে প্রতিটি

মানুষের কিছু ব্যক্তিগত দায়িত্ব আছে এবং সময় এসেছে তা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করার। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেই হোক বা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যেই হোক—প্রতিটি মানুষকে যদি দায়িত্ব সচেতন না করা যায় তাহলে এসব সমস্যার সমাধান কোনদিনই হবে না। যে সব দম্পতি বছরের পর বছর সন্তানের জন্ম দিচ্ছে বা যে চাষীটি সুদূর গ্রামের মাঠে হেলাফেলায়, চাষ করছে, যদি না জানে, না বোঝে তাদের এই কৃতকর্মের ফল কিভাবে দেশের ও দশের ক্ষতি করছে, কিভাবে তারা দায়িত্বসচেতন হবেন? এসব সমস্যার সমাধানে জনসংযোগকে দুভাবে কাজ করতে হয়। প্রথমত জনসাধারণের নিজস্ব সমস্যাকে জানা ও বোঝা এবং সে সব সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে দেশের সমস্যার মোকাবিলায় তাদের সক্রিয় সমর্থন পাবার চেষ্টা করা। দ্বিতীয় কাজটি হল সাধারণ মানুষের কাছে নিত্য নতুন চিন্তাধারাকে পৌঁছে দেওয়া যাতে প্রগতির পথে ভাল মিলিয়ে দেশের সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলতে পারেন।

উন্নত দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকায় যে কোন প্রয়োজনে দ্রুত জনসংযোগ সম্ভব হয়। এসব দেশের সাধারণ মানুষ খুব সহজেই সংবাদ বা তথ্য জানতে পারেন। শিক্ষার মান উন্নত হওয়ার পর সহজেই সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করতে পারেন। দেশের ও জাতির একজন হিসাবে প্রতিটি কর্তব্য সচেতন মানুষ সমাধানের চেষ্টায় ব্রতী হতে পারেন। অন্যদিকে উন্নয়নশীল ও গরীব দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায়, দ্রুত জনসংযোগ সম্ভব হয় না। ফলে সব স্তরের মানুষের কাছে তথ্য, সংবাদ, সমস্যা ও সমাধানের সূত্রগুলি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না। একই সঙ্গে জানা সম্ভব হয় না সব স্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা সুবিধা-অসুবিধার কথা। ফলে একটা বিরাট ফাঁক সব সময়েই থেকে যায় বা অগ্রগতিকে প্রচণ্ডরকম ব্যাহত করে। এ কারণে আজকের পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দেশগুলির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত জনসংযোগের জন্য প্রচার মাধ্যমগুলির উন্নয়নও দরকার। নোবেল পুরস্কার বিজেতা ও অ্যামেনিষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্যোন ম্যাকব্রাইডের মতে, বিশ্বের সব মানুষের কাছে নব সমস্যার কথা খোলাখুলিভাবে পরিষ্কার করে বলা দরকার। তাহলেই সমাধানের কথা চিন্তা করে সবাই পরস্পরের কাছে আসবে। একাজে দরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও নিবিড় জনসংযোগ সারা পৃথিবীর মানুষকে এক

পরিবারভুক্ত বলে ভাবতে সাহায্য করতে হবে। এই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ম্যাকব্রাইড কমিশনের তৈরি 'নিউ ইনফরমেশন অর্ডার' সম্পর্কিত রিপোর্টের নাম দেওয়া হয়েছে 'মেনি ভয়েসেস, ওয়ান ওয়ার্ল্ড'! তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে বন্ধ করার জন্যেও শ্যোন ম্যাকব্রাইডের অক্লান্ত চেষ্টা আজ পৃথিবীর প্রতিটি শান্তিকামী মানুষকে নাড়া দিয়েছে।

দুঃখের বিষয় ম্যাকব্রাইডের এই কাজে বাদ সাধছেন পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির স্বার্থান্বেষী মহল। অন্যদিকে এদের প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে এড়িয়ে ইউনেস্কো চেষ্টা করছে কিভাবে ম্যাকব্রাইড কমিশনের সুপারিশগুলি রূপায়িত করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তথ্য ও সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত গড়ে তোলা যায়। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ইউনেস্কো শুরু করেছে ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম টু ডেভেলপ কমিউনিকেশন। এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের সব দেশে উন্নত ধরণের ছাপাখানা স্থাপন, টেলিভিশন ও রেডিও স্টেশন তৈরি করা এবং সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও ম্যাকব্রাইড কমিশনের সুপারিশে আছে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার, সংবাদের বিকৃতি বন্ধ করে গুণগত মান বজায় রাখার, নতুন 'কোড অফ এথিকস' তৈরীর মাধ্যমে সংবাদ-পত্রগুলিকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা প্রভৃতি কাজের। ম্যাকব্রাইড কমিশনের এই সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত হলে সারা বিশ্বে যোগাযোগ তথা জনসংযোগের কাজে প্রভূত উন্নতি হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকে গুরুত্ব দেবার জন্য ১৯৮৩-কে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আশা করা যায়, পিছিয়ে থাকা দেশগুলিতে সবাই এই গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি করে এ বছর থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনসংযোগের কাজে নতুন উদ্যোমে ব্রতী হবেন। যদি তারা উপলব্ধি না করতে পারেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে উন্নয়নের প্রচেষ্টায় দেশের জনগণকে শরীক করে তুলতে পারবেন না। উন্নত দেশগুলির বাধা দেবার চেষ্টা সফল হবে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উন্নত দেশের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সৃষ্ট এই বাধাকে একদিন না একদিন উন্নয়নশীল ও গরীব দেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবেন। নিবিড় জন-সংযোগই তৈরী করবে এ কাজের প্রথম সোপান।

মিরোস্লাভ হোলুবের কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১. আমেরিকা

একটা পিয়ানো ছুটে চলেছে
মাত্রাছাড়ানো বেগে
রাতের বিতান ধ'রে

সোজা গিয়ে ধাক্কা খায়
আইল্যাণ্ড পার্কের কাচের সিন্দুকে
ভেঙে চুরমার
আর মাইলফলকগুলোর গায়ে জাপটে থাকে
স্বর কোমল-ঋষভ
কোমল-ধৈবত
কোমল-গান্ধার।

কালো মেয়েটির
সিন্ধুআনন
নুয়ে পড়ে আমাদের ওপর,
পিয়ানোর রক্ত ঝ'রে চলে ক্ষীণ-এক
অস্ফুট সুরেলা ধ্বনিতে—

আমেরিকা

কিন্তু তুমি তা প্রমাণ করতে পারবে তো ?

২. লণ্ড আইল্যাণ্ডে রাত্রি

যেন বাদুড়ের মড়ক লেগেছে
এমন ভাবে রাত ঝাপট মারে গাছের ডালে।
জেলিমাছের মতো বাড়িগুলো ভাসে
ম্যাগ্‌নোলিয়া বুলভার ধ'রে।

আমরা উলটো-পৃথিবীর জীব।
আমরা হাতে হাঁটি।

স্বয়ংক্রিয় ঝাঁঝরিরা
উঠোনে জল ছিটোয়
যেন পৃথিবী এখনো আছে।

কিন্তু এটা তো মাত্র পৃথিবীর এক স্বতঃসিদ্ধ জমি।
স্বতঃসিদ্ধ বাড়ি
জানলায় চোখের জল।

৩. রাত সাড়ে-এগারোটা, কার রকঅ্যাণ্ডরোল

মোড়ের কাছে এক ষাঁড় ফেটে পড়ে
গ'র্জে জানাতে
জগতের অবস্থা, বয়েস।

মোড়ের কাছে এক কালো মেয়ে যায়
শাদা পোশাকে—
যেন
শুভ্রতাই।

মোড়ের কাছে এক রক্তরাঙা চাঁদ
সমুদ্রকে মাই দেয়।

আর দূরে শেষ বাস
ছেড়ে দেয়.
অতএব এখন কিছুই নেই
যা থেকে তুমি

চ'লে যেতে পারো।

৪. অ্যাটলান্টিক পাড়ি

ব্যাপারটা কেমন অপ্রতিভ আর অস্বস্তিকর
কিন্তু তখনও যে বড্ড বেশি জল ছিলো
ছিলো বড্ড বেশি হাওয়া
আর বড্ড বেশি অসীম
ঠিক রেলিংটাকে পেরিয়েই।

লবণাক্ত দূরত্বের মধ্যে
ঢেউ ঢেউ আর ঢেউয়ে তোলপাড়
(ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ)
পুরাতন সন্ধির এক চাষা দেখা দেয়
সন্ধেবেলায় আর চাষ ক'রে যায়
হালদেয়া জমির পর জমি।
আর দূরে চার পাশে
আকাশ আর সমুদ্রের মধ্যকার বিপন্ন ফাটলের মধ্যে
একমাত্র বীজ ছিলো
জাহাজ, আর আমাদের
ধীরে-সুস্থে চিবিয়ে খাওয়া হৃদয়।

আর আমরা যেটা করতে পারি তা শুধু
কোনোমতে আঁকড়ে ঝোলা
সময়ের সূচনা থেকে
তার সংহার পর্যন্ত

যদিও ব্যাপারটা
সত্যি ভারি অপ্রতিভ আর অস্বস্তিকর।

৫. রকেফেলার সেণ্টার

এক তাজ্জব বুড়ো যার মনে হয় সবাই তার পেছনে লাগছে
/আচ্ছা, ওয়াল্ট হুইটম্যান সম্বন্ধে
আপনার কী মনে হয় ? /
ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউয়ে রাস্তা পেরোয়
আলো যখন লাল
আর বেশ শান্তভাবেই শাপ দিতে-দিতে
শান্ত ভাবেই গুনগুন করতে করতে
পায়েচলার রাস্তা দিয়ে এগুতে থাকে
মার্বেলের আস্তরের ওপর পা ফেলে দাঁড়ায়
আর হেঁটে যায় সমকোণে,
দেমাকে সটান, আনুভূমিক,
হেঁটে যায় সমকোণে
কোনো জানলার দিকে না-তাকিয়ে,
হেঁটে যায় সমকোণে,
আটষট্টি তলার ওপর,
হেঁটে যায় সমকোণে

আর নীল মেঘমণ্ডলে যে-নাটক হচ্ছিলো তা
তাকে আলতোভাবে হাতছানি দিয়ে ডাকে আর একটা খিস্তি ক'রে
উধাও হ'য়ে যায়, সব কবিতাকে
দারুণ ভাবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার সুযোগ দিয়ে।

৬. পার্ক অ্যাভিনিউ

যদি নগরী তার বাসিন্দাদের ওপর
শাসন চালায়, তবে
কী আর ক্ষতি, বেশ ভালোই তো, কারণ কেবল জৈব পদার্থ
গ'লে-প'চে হেজে যায়, উদ্‌জানের গন্ধকমিশ্রের
বুড়বুড়ি তুলে। যে-কালে কোনো পাথরের মৃত্যু
হ'য়ে যায় কোনো মেঘ আর সমান্তরালের জ্যামিতি
হ'য়ে ওঠে অসীমের একমাত্র আশা।

একটা লাল-শাদা-নীল হেলিকপ্টার
নেমে আসে প্যান অ্যামের ওপর, আই-বি-এম কম্পিউটারগুলো
বিলি ক'রে যায় খাঁটি জাতের চৈতন্য প্রবাহ,
ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্কের সিন্দুকগুলো ওজন করে
তাদের টন-টন ভারি স্বপ্নগুলো আর সীগ্রামের ফোয়ারাগুলো
অমায়িক ভাবে প্রেম ক'রে যায়। ব্রন্‌জ আছড়ে পড়ে ওপরমুখো
নিরাপদেই।

দশহাজার কাচের চোখ দেখতে থাকে,
দেখার মারাত্মক হতাশায়
না-ভুগেই।

৭. জার্সি সিটি

কোনো নগরীর সংকট মুহূর্ত।
স্নায়ুরোগের খিঁচুনিতে এলোমেলো
কারখানাগুলো ঘুরে বেড়ায় পোড়ো জমিতে।
ধূমায়িত বহ্নিমান শকুনগুলো
আঁচড়ে-আঁচড়ে বার ক'রে আনে পথচারীদের যকৃৎ।

দুর্গন্ধছেটানো মেঘে-মেঘে ডুবে-যাওয়া
দেয়ালগুলোয় ধাক্কাধাক্কির শব্দ ;
মঙ্গলগ্রহের জীবরা সেই-যে কত বছর আগে
টাইমবোমা ফেলেছিলো, তার বিস্ফোরণ
প্রত্যাশিত।

চলি। বিদায়।

আমি শৈশবের জন্য অপরাধী।
আমার সারা পৃথিবী ঘুরে আসার জন্য
যে-ঘড়িটা ঠাকুমা তুলে রেখেছিলেন,
সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

৮. পাতাল রেলের স্টেশন

আজ সন্ধ্যায় মিস্টার হাওয়ার্ড টি. লুইস,
ঠিকানা অজ্ঞাত, বিষণ্ণ আর অবসন্ন,
পরনে ছাইরঙা ওভারকোট আর বাদামি টুপি,
ক্যানাব্রসি লাইনের বি-এম-টি ধরবেন ব'লে ঠিক ক'রে,
দেখতে পেলেন এইট্‌থ অ্যাভিনিউয়ের শেষ স্টেশনে
একজনকে পরনে ছাইরঙা ওভারকোট আর বাদামি টুপি,
যার মুখ বিষণ্ণ আর অবসন্ন
মিস্টার হাওয়ার্ড টি. লুইসের মুখ,
এদিকে বেড়ার পাশে ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে
দাঁড়িয়েছিলো এক লোক, ছাইরঙা ওভারকোট গায়ে, মুখচোখ বিষণ্ণ,
যার মুখ হাওয়ার্ড টি. লুইসেরই মুখ আর চুপচাপ তাকিয়ে আছে
নোংরা সিঁড়িগুলোর তলায় সেগুলো বেয়ে উঠে এলো
বাদামি টুপি-পরা এক লোক, বিষণ্ণ আর অবসন্ন,
এমন-একটা মুখ নিয়ে যেটা হাওয়ার্ড টি. লুইসেরই মুখ।

আর তারপর ঘোরানো দরজার
জীর্ণ কাঠের গরাদের মধ্য দিয়ে এলো এক স্ত্রীলোক, বিষণ্ণ আর অবসন্ন,

ঠিকানা অজ্ঞাত, হাতে বটুয়া মাথায় বাদামি
টুপি যার মুখটা
সব পুরুষেরই মুখের মতো আর, অতএব, হাওয়ার্ড টি. লুইসেরও আর
দূরে পায়ের শব্দ আর কাচে ঘাবড়ে-যাওয়া সন্তর্পণ পায়ের শব্দ
পায়ের শব্দ সেই তাদের যাদের শরীর নোয়ানো আবছায়ায়
আর আলোয় ফ্যাকাশে এ-সব পায়ের শব্দই
হাওয়ার্ড টি. লুইসের কোন্ অজ্ঞাত ঠিকানা থেকে
কোন্ অজ্ঞাত ঠিকানার উদ্দেশে, মাঝে-মাঝে
ঘোরানো দরজা ঘুরে যায় আবার এমন আওয়াজ ক'রে
যেন কোনো ঝুড়িতে পড়লো গিয়ে কারু মাথা, কিংবা বেড়ার ওপাশে
দেখা যায় এক মানুষ সে স্ত্রী নয় পুরুষ নয় আর
তার কোনো ঠিকানা নেই, কিন্তু তাছাড়া হুবহু একেবারে
হাওয়ার্ড টি. লুইসের মতো, পায়ের শব্দ শোনা যায়,
মাথাগুলো, গরাদগুলো, দূরত্ব, আলো আর সুড়ঙ্গ
সবকিছু চুষে খেয়েছে এই চিহ্ন এইট্থ অ্যাভিনিউ এইট্থ অ্যাভিনিউ
এইট্থ অ্যাভিনিউ
বেড়ে-ওঠা তীব্র হওয়া কানেতালালাগানো গুঞ্জনে।

ট্রেন যখন চ'লে গেলো দলছুট এক হাওয়া
এক খবরকাগজের পাতাগুলো উড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো
যাতে ছিলো এক প্রতিবেদন
অজ্ঞাত ঠিকানার, এক লোকের ভাগ্যের, ছিলো তার পরিচয়,
যার পরনে ছাইরঙা ওভারকোট আর বাদামি টুপি,
যে বিষণ্ণ আর অবসন্ন।

৯. দেবায়তন

সর্বত্রই ভগবান বিরাজমান।
আমার মনে হয়

ঢ্যাঙা অশ্বিসার
সর্বশোষক শুশু,

দিকে-দিকে সজাগ চক্ষু, পল-কাটা,
ঘেমো দাগ

তিনি শুধু তাগ করেন আর তাগ করেন, আর চুপচাপ থাকেন,
চুপচাপ থাকেন আর তাগ করেন,
অতএব আছেন।

কোনো জানলার, রাস্তার কোনো মোড়ে,
গর্তে, নর্দমায়,
মেঘে, আমাদের
জীবদ্দশায় তথাস্তু।

প্রসঙ্গত, আমরা যে এখানে আছি
সে তো কেবল এই কারণেই
যে কেউই
চাঁদমারিতে লাগাতে পারেনি এখনও।

১০. ব্রুকলিন গোরস্থান

মৃতদের চিৎপটাং ফ্ল্যাটবাড়ি।
মাটির তলার শোবার ঘরগুলো থেকে
ফিনকি দিয়ে বেরোয় ছোটো-ছোটো সব উষ্ণ প্রস্রবণ
সোৎসাহ সব বিদেশী কণ্ঠের।

শেষ প্রশ্নগুলোর
জরুরি আর উত্তেজিত হট্টগোল :
ক-টা পা থাকে ডিমের ?
আর সবুজ রঙের কুকুরেরা—তারা কি হাওয়ার চেয়েও হালকা ?
তোমার প্রীহায় কি আগুন ধ'রে যায় ?
একবার ফ্লাশ টানলেই কি কর্কটরোগ সাফ হ'য়ে যায় ?
সেণ্ট এলিজাবেথের পোদ কী-রকম ছিলো ?
কখনো চেখে দেখেছো বৃক্কের পাথর ?
তোমারও দু-ঠ্যাঙের ফাঁকে কোনো প্রশ্নচিহ্ন গজাচ্ছে না কি ?

তলা থেকে
হাজারটা পরদরদী হাত
তালা আটকে দিতে চেষ্টা করছে,

কিন্তু মাটি কিছুতেই বন্ধ থাকবে না।

১১. কুড়িয়ে-পাওয়া-কবিতা

শিরোণাম

প্রেসিডেন্ট আর মিসেস জনসন
সঙ্গে ছিলেন তাঁদের বড়ো মেয়ে লিণ্ডা
আজ ন্যাশনাল সিটি ক্রিশ্চিয়ান চার্চে প্রার্থনা করেছেন
মানবিক অধিকার
আর বর্ণসৌষম্য বজায় রাখার জন্য।
মিস জনসনের পোশাক ছিলো,
আমেরিকায় নির্মিত,
সাদা
আর চকোলেট খয়েরি,
ভারি সুতি কাপড়ের।

নিউ-ইয়র্ক টাইমস, ৩১ জুলাই ১৯৬৭

মধ্যপ্রাচ্যবিতর্ক, নিউ-ইয়র্ক

পুলিস
৪৭ স্ট্রিটের দক্ষিণ প্রান্তকে
সোভিয়েৎ বিরোধী
আর উত্তর প্রান্তকে
সোভিয়েৎ পক্ষীয় পিকেটের জন্য
নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে।

তবে
পুলিশ ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি
স্যালেম, ম্যাসাচুসেট্‌সের
ইয়োজেফ মিওট-ম্রুজকে নিয়ে কী করবে,
যিনি দাঁড়িয়েছিলেন ফার্স্ট অ্যাভিনিউতে
বৃষ্টির মধ্যে
তাঁর বাম গলা বন্ধে লাগানো ছিলো
স্ফটিকে তৈরি এক মার্কিন নিশান।
তাঁর হাতে ছিলো এক পোস্টার, তাতে লেখা :

য়িহুদিরা সব খুনে।
সাম্যবাদ য়িহুদি।
আপাদমস্তক।
সাম্যবাদ ঠেকান।
পোলাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমিতিবদ্ধ।

পুলিশের এক কাপ্তান
ফ্রান্সিস আর কেলি
প্রথমে পান্ মিওট-ম্রুজকে
নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ দিকে।
একটুক্ষণ কথা বলার পর
কাপ্তান কেলি মাথা নাড়তে-নাড়তে
চ'লে যান, তিনি বিড় বিড় ক'রে বলছিলেন :
কোথায় যে লোকটাকে রাখবো
সে কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না।

নিউ-ইয়র্ক টাইমস, জুন ১৯৬৭

১২. রাক্ষসতত্ত্ব

বাগানের রাস্তায় দৈত্যদের পুণোদর ছোঁ,
শাদা থালার মতো চোখ,
গোড়ালিতে শক্ত আঁটা ক্রুশের রক্তরাঙা দাগ
এখান থেকে অসীম পর্যন্ত।

আগুনের ডুকরে-ওঠা মায়ানেকড়ে
ঢুকে পড়ে শহরগুলোয়
গ'ড়ে উঠতে-না-উঠতেই।

সাফল্যের পিঠচাপড়ানো আহ্লাদ
পৃথুলা মেদিনীর গায়ে
রবারের স্প্রিঙে লাফঝাঁপায়
নিওন আলোয় দোল খায়,
ছাতে দুপদাপ হাঁটে।

আর দুর্ভাগ্যের বাঁশি-মার্কা উড়োভূত,
সুতোবাঁধা, আমাদের পেছনে হিঁচড়োয়।

সবখানেই বিস্তর আছে এ-বস্তু,
চকমেলানো ঝকঝকে সিনেমাগুলোর ঝলসানিতে,
ভ্যান থেকে গড়িয়ে-পড়া বোতল ভরা বাক্সের ঝনঝনানিতে।
ছোটোখাটো বুদ্ধিতে-যার-ব্যাখ্যা-চলে-না-এমন-অলৌকিক-কাণ্ড-ঘটাবার
অনুজ্ঞালিপি নেবার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

আর আমাদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে আছে
যাকে বলা যায়
ছোটো এক ধরনের বাক্স,
দেরাজের মতো বড়ো কখনো
কিংবা মরা ইঁদুরের চোখের মতো
চুপশে-যাওয়া,

ভেতরে কী যেন নখ আঁচড়ায়,
কিংবা পেকে ওঠে পরিশ্রমে,
কিংবা চুপচাপ বানাতে থাকে কিছু,

কিন্তু খুলতে আমাদের সাহস হয় না
কারণ অনেকবারই
ভেতরে কিছুই ছিলো না।

১৩. দুই

আরো-একবার এই অধঃপতন
পা ওপরে মুণ্ডু তলায়
কোনো-একটা আছাড়খাওয়া মহাকাশযান থেকে
তুহিন শূন্যতার মধ্য দিয়ে,
শরীর থেকে জামাকাপড় হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে খোলে যেন
আর কানে তালাধরানো পৃথিবী এগিয়ে আসে
কোনো ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড ধর্মান্ধ নতুন আচারবিধির মতো,
স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় ভোগা কোনো কামানের গোলার মতো।

আর হঠাৎ—মাটিতে নেমে প'ড়ে
আর হঠাৎই—দুই টুকরো হ'য়ে গিয়ে—
আর হঠাৎই ডুবে গিয়ে
একজনের মধ্যে আরেকজন
আমরা তো
পৃথিবীর গায়েই পৃথিবীর ছাপ
আর আমাদের মধ্য থেকে তোড়ে বেরিয়ে আসে কালো ন্যাপ্‌থা
কোনো দৈবাৎ-পাওয়া ফ্ল্যাটবাড়ির নদীর খাত দিয়ে
আর চুঁইয়ে ঢুকে পড়ে
দরজার পাল্লায় চেপটে-যাওয়া
প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদূতদের মধ্যে।
আর তারপর রাত্রি ছাড়া আর কিছুই নেই

আমাদের জন্য
আর তারপর ঊষা ছাড়া আর কিছুই নেই
আমাদের জন্য
আর শুধু মহাকাশচারীদের শুষ্ক ধূসর নিঃসঙ্গ মহিমা
যারা তাদের ডানা হারিয়েছে
কোনো অচেনা বিদেশ বিভূঁইয়ে।

১৪. কংক্রিট

আগ্নেয়শিলায় তৈরি এক ধূসর নক্ষত্র :
কংক্রিটের দেয়াল, কংক্রিটের মাটি,
কংক্রিটের আকাশ, কংক্রিটের গাছপালা,
কংক্রিটের দোলনা, হুল্লোড়ে, কংক্রিটের মায়ামমতা।

কয়েকটা খড়বাঁশের পুতুল
তাদের নাটকটা অভিনয় করে। পাঞ্চ হ'লো ড্যাগন,
আর ড্যাগন, পাঞ্চ। গোল্লায় যেতে-থাকা
দেবদূতদের সে কী কোলাহল।

কংক্রিটের তোরণগুলোয় আলখাল্লাপরা কনস্থলরা
বর্বরদের প্রতীক্ষা করে। কিন্তু
আর তো কোনো বর্বর নেই কোথাও।
শুধু কেবল পাথরের কোমেন্‌দাতোরে তুলে ধরে
আমাদের চামড়ার সমাধিশিলা
আর ডুকরে ওঠে বদ্ধনিশ্চল অন্ধকারে।

কংক্রিটের দেয়াল। কংক্রিটের চিন্তাভাবনা।
কংক্রিটের রেতঃপাত। কংক্রিটের কেশপাশ।
আর যখন আমরা ছুঁই, বালি ঝ'রে পড়ে মিহি ধারায়।
আরো-ভালো কংক্রিটের
প্রয়োজন।
যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে এতদিনে।

গল্প

সমুদ্র যাত্রা

শচীন দাশ

মাঠ পার হয়ে আলের ওপরে উঠতে গিয়েই পড়ে গেল সুধন্য। মাঝখানে সরু ঝোরার মতো একটা নালা ছিল। সামান্য লাফিয়ে সেটা টপকাতে গিয়ে হাঁটুতে একটু মোচড় খেল। পরে দেহের ভারসাম্যটা রাখতে না পেরে নালার ভেতরে পড়ে যেতে যেতে সুধন্য দেখল ডান পায়ের সেই জায়গাটা ফেটে পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তখন আর কোনো হুঁশ নেই ওর। চেঁচিয়ে ডাকা তো দূরের কথা, প্রচণ্ড ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে মাথার ভেতরে এমন একটা অন্ধকার ঢুকে গেল যে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নালার জলকাদার ভেতরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল সে।

কাছাকাছি মাঠ পার হচ্ছিল এক বাগালি। হাতে কঞ্চি, পরণে একটা ছেঁড়া জামা। প্রাকৃতিক টানে, ছাগল চরাতে চরাতে, নালার ধারে এসে বসতেই সুধন্যকে দেখে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে প্যান্টের দড়ি ধরে সে ছুটল বাজারের দিকে।

বাজারে এখন কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে ঠিক। অন্তত আর কাউকে না পাওয়া গেলেও চরণ জানার চায়ের দোকানে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এসে গেছে সেই লোকটা। লম্বা কালো স্বাস্থ্যবান চেহারা। কথা বলে দ্রুত গতিতে। আর গাঁয়ের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে সময়ে-অসময়ে। তাকে পেলে আর কাউকেই বলতে হবে না। শোনামাত্রই সে ছুটবে মাঠের দিকে।

তাই হল। খবরটা শুনেই লোকজন নিয়ে প্রফুল্ল গেল মাঠের ওদিকে।

বাঁধের ওপরে উঠে দৌড়তে দৌড়তে যখন সেখানে গিয়ে পৌছোল তখনও তেমনি পড়ে আছে সুধন্য। মুখটা একদিকে কাত করা। একটা হাত নালার ওপরের দিকে। আর একটা হাতে খমচে ধরা এক মুঠো মাটি।

প্রফুল্ল নিচু হল। প্রায় নালার ভেতরে নেমে সুধন্যকে সোজা করতে গিয়ে দেখল পরণের লুঙ্গিটার চারপাশে পুঁজ-রক্তে মাখামাখি। নাক থেকেও যেন নিঃশ্বাস পড়ছে না। চোখের পাতা বুজে এসেছে।

প্রফুল্ল চমকে উঠল। এই তো সকালের দিকেও বেরোবার সময় দেখা হয়েছিল। এর ভেতরে এমন কি ঘটল! তবে কি পায়ের সেই জায়গাটায় কিছু হয়েছে—! খুব সাবধানে লুঙ্গিটা একটু তুলতে গিয়েই প্রফুল্ল ভয় পেল। হাড় মাংসের ভেতরে পায়ের মালাই চাকির নিচে একটা গভীর গর্ত। লাল থকথকে রক্তের পাশাপাশি গোল মতো কি যেন একটা বেরিয়ে এসেছে। যেমন তুলেছিল তেমনি আস্তে আস্তে লুঙ্গিটা নামিয়ে প্রফুল্ল ঘাড় ফেরাল। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে তড়িঘড়ি কাকে ডাকল সে।

—এই বাদল—বাদল—

বাদল আসতেই প্রফুল্ল বলল, তুই চল্যা যা। শিগগিরি একটা নৌকা রেডি কর। ওকে নিয়ে আসছি আমরা। এখুনি একবার হাসপাতালে যেতি হবে।

হাসপাতাল! কথাটা শুনেই চমকে ওঠে বাদল। একবার মুখ নামিয়ে সুধন্যর দিকে তাকায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, কেন আবার কি হলরি প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল জানায়, সিই সি জায়গাটা ফেটে গেছে। এখুনি লিয়ে না গেলি আর চেতন ফিরবেনি।

বাদল ভয় পেল। দেখার ইচ্ছে হলেও আর জায়গাটা দেখতে চাইল না সে। প্রফুল্লর কথা শেষ না হতেই সে ছুটল তাই নদীর দিকে।

নদীতে এখন মরা কোটাল চলছে। কারো না কারো একটা নৌকা পেয়ে যাবে ঠিক। অন্তত আর কোনোটা না পেলেও প্রফুল্লর নিজের নৌকা তো জলে আছে। ভাবতে ভাবতে মাঠ পার হয়ে বাদল উঠল বাঁধের ওপরে।

কিন্তু বাঁধ থেকে নেমে একটু যেতে না যেতেই দেখে অনেকে ছুটে আসছে। তাহলে এরই মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। সুধন্যকে ভালবাসে অনেকেই। খবর পাওয়া মাত্রই চলে এসেছে এখানে। তবে এত ভিড় থাকলে তো ওকে নিয়ে যেতে অসুবিধে হবে। বাদল ভাবল, তার চেয়ে ওদের নদীর ঘাটে যেতে বলাই ভাল। সুধন্যকে দেখতে পাবে। তাছাড়া ভিড় হলেও কোনো অসুবিধে

নেই। কাছাকাছি গিয়ে বাদল তাই বোঝাল অনেককে। যারা বুঝল গেল নদীর পাড়ে, যারা বুঝল না ছুটল মাঠের ওধারে।

সুধন্যকে ঘিরে মাঠের ভেতরে ততক্ষণে একটা ভিড় জমে উঠেছে। হুমড়ি খেয়ে ওর চারপাশে বসে পড়েছে অনেকেই। ওর মুখ মুছিয়ে দিয়েছে। চোখের পাতায় জলের ঝাপটা দিয়েছে। এমন কি মাথায় হাত বুলিয়ে ডেকেও উঠেছে কেউ কেউ। কিন্তু সুধন্যর তবুও হুঁশ নেই। মড়ার মতো জলকাদার ভেতরে তখনও সে পড়ে আছে সাড়াশব্দহীন।

প্রফুল্ল আর দেরী করে না। সুধন্যকে তুলতে বলে নিজেই প্রথমে পায়ের দিকটা ধরে। পরে শ্রীদাম, অবিনাশ আর অর্জুনরা মিলে তুলে ধরলে ওদের সতর্ক করে দেয়। মুখে বলে, হেই দেখো হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার হয়ি চল গো। এট্টু টাল খেলি আর দেখতি হবে না।

বলতে বলতে নিজেও খুব সাবধানে সুধন্যর পা দুটোকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে। কিন্তু ধরতে গিয়েই মনে হয় ডান পায়ের সেই জায়গাটা যেন খুলে বেরিয়ে আসছে। প্রফুল্ল চমকে ওঠে। যদি সত্যিই একসময় খুলে আসে, এই ভয়ে সে অজুনদের সাবধান করে। আস্তে চলার পরামর্শ দেয়।

কিন্তু আস্তে বললেও উপায় নেই। আগ্রহায়ণের মাঠ। চারদিকে কাটা ধানের গোড়াগুলো জেগে আছে। এর ভেতরে আস্তে হাঁটা তো দূরের কথা, পা ফেললেই এলোমেলো পা পড়ে পায়ের গতি বেড়ে যায়। তাছাড়া এখন যত তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে সুধন্যর বাঁচার রাস্তা ততই পরিষ্কার। হাসপাতাল বলতে তো সেই দ্বারিকনগর। কাছাকাছি নয়। নদী পথেই ছ-সাত মাইল রাস্তা পার হয়ে তবে সেখানে পৌছতে হয়। এরপরে আছে আবার ঘাটে নেমে মাইল দেড়েক হাঁটা।

প্রফুল্ল চিন্তায় পড়ে।

হাসপাতালে যাওয়া সুধন্যর এই প্রথম নয়। এর আগেও দুদুটো হাসপাতালে মাস দুয়েক কাটিয়ে এসেছে সে। তবে সেবারে ছিল রাস্তার ওপরে। নামথানায় নেমে নারায়ণপুরের মাস্টারমশাই মণিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল প্রফুল্লরা। কথাবার্তা বলে বিকেলের দিকে ফিরে আসছে এমন সময় রাস্তার ওপরেই পা ছড়িয়ে বসে পড়ল সুধন্য। বলল, ডান পা টা তার ভেঙে আসছে। হাড়ের ভেতরে অসম্ভব যন্ত্রণা। যেন কেউ কিছু দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে তার পায়ের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে।

অবস্থা দেখে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রফুল্ল। সুধন্যর দিকে তাকিয়ে সেও বসে পড়েছিল রাস্তার একধারে—সুধন্যর পাশেই। ওর পাটাকে কোলের ওপরে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে এরপর মালিশ করে দিয়েছিল। ভেবেছিল, যদি এতে ব্যথা কমে। কিন্তু কমা তো দূরের কথা, বরং দেখতে দেখতে এমন বেড়ে গেল যে প্রফুল্ল আর বসে থাকার সাহস পেল না। সঙ্গে সুধন্য ছাড়াও ছিল বাদল। ওরই জিম্মায় সুধন্যকে রেখে সে ছুটল গঞ্জের দিকে।

গঞ্জ বলতে কাছাকাছি নদীর দুপাশের হাটবাজার আর দোকান পাট। বরফকল আর কাঠচেরাইয়ের দোকান। পান বিড়ি সিগারেটের ছোট ছোট ঝুপড়ি। চুন্নুর ভাটিখানা। এরই একদিকে আড়তদারদের মাছ চালান দেওয়ার ম্যাটাডোরগুলো দাঁড় করানো থাকে। বুদ্ধি করে ওই ওরই একটা ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল প্রফুল্ল। সুধন্যকে তুলে এরপর সোজা নিয়ে গিয়েছিল কাকদ্বীপ। ওখানকারই এক হাসপাতালে।

হাসপাতালে ভর্তি হয়েই রোগটা ধরা পড়ল সুধন্যর—ক্যানসার! পায়ের হাঁটুতে ভেতরের হাড়ের মজ্জায় ক্যানসারের জীবাণু ঢুকে পড়েছে। কাজেই আর ওখানে থেকে লাভ নেই। ভাল চিকিৎসা হবে না। হাসপাতালের ডাক্তাররা তাই জানাল রোগীকে এখন কলকাতার কোনো বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। এখুনি না নিয়ে গেলে এরপর সুধন্যর বেঁচে থাকাই মুশকিল।

বাপের ছিল জমিজমা সামান্য। তারই কিছু বেচে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হল সুধন্যকে। ওরা ওর পায়ের ছবি তুলল, পাটাকে ছুরি দিয়ে কাটল, তারপর সেলাই-ফোঁড়াই করে একটা অদ্ভুত মেশিন দিয়ে আগুনের মতো গনগনে তাপ লাগিয়ে লাগিয়ে প্রায় মাস দুয়েক পরে যখন ছেড়ে দিল তখন সুধন্যর ব্যথা কমল বটে কিন্তু পাটা গেল বেঁকে। হাঁটতে গেলেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। বেশি হাঁটলে ক্লান্ত লাগে। হাসপাতাল থেকে অবশ্য বলেছিল মাঝে মাঝে এসে দেখিয়ে যেতে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি সুধন্যর। এমন কি প্রফুল্লও নিয়ে যেতে পারেনি ওকে। ফলে যাবো যাচ্ছি করে করেও বছর দুই ঘুরে এল।

প্রফুল্ল তাকায়। সামনে ক্লাব ঘর। ঘর পার হলেই উঁচু লম্বা বাঁধের নিচেই নদী। এদিকে রাস্তার দিকে মুখ করে বেশ কিছু গুঁড়োগাড়া, মুখে উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে। ওরা সুধন্যর পাড়ুয়া। ক্লাব-ঘরে নন-ফরম্যাল এডুকেশনের স্কুল

বসে। পায়ের অপারেশন হওয়ার পর থেকেই সুধন্যকে এখানে পড়াবার দায়িত্ব দিয়েছে প্রফুল্লরা। রোজই সকাল থাকতে এসে পড়ে। আজ আসেনি বলে ওরা অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। একটু আগেই খবর পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। প্রফুল্ল জানে, সুধন্যকে দেখে ওর পেছনে পেছনে এবার দৌড়ে আসবে বাচ্চাগুলো। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুধন্যকে নৌকায় তোলা দেখবে। আর যতক্ষণ না নৌকাটা অনেকদূরে চলে যাবে ততক্ষণই বাঁধের ওপরে ওরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

সে রকমই হল। সুধন্যকে নিয়ে কাছাকাছি আসতেই বাচ্চাগুলো প্রফুল্লর পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগল। প্রফুল্ল ভাবল বারণ করবে আসতে এবং সেজন্য বলতেও যাচ্ছিল কথাটা। কিন্তু আর বলা হল না। তার আগেই চোখে পড়ল সুধন্যর ঠোঁট জোড়া কাঁপছে, চোখের পাতা নড়ছে, আর মুখ চোখে একটা তীব্র যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। সে বুঝল, এখুনি জ্ঞান ফিরবে সুধন্যর। একটু পরে সে নিশ্চয়ই ফিসফিস করে কথাটথাও বলবে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করবে প্রফুল্লকে।

আর সেসব ভেবেই এতক্ষণে একটু স্বস্তি পেল প্রফুল্ল। আনন্দে আর দায়িত্ববোধে সচেতন হয়ে, আরও সাবধানে সুধন্যর পা দুটোকে গভীর করে জড়িয়ে একটু তাড়াতাড়িই এবার বাঁধের ওপরে উঠতে লাগল।

কিন্তু বাঁধ থেকে নেমে নৌকায় উঠতে গিয়েই চমকে উঠল সে। এ কার নৌকা টেনে এনেছে বাদল! কেন ঘাটে কি আর নৌকা ছিল না! এখন তো সিজিন নয়। গোবিন্দ বংশী আর নিত্যপদর নৌকা তো আজ কদিন ধরেই পড়ে আছে ঘাটে। অন্তত সে সবের একটা না পেলেও তার নিজের নৌকা তো জলে আছে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বাদলকে ডাকল প্রফুল্ল। বাদল আসতেই জিজ্ঞেস করল, কি রি ঘাটে আর নৌকা ছিল নি?

বাদল ঘাড় নাড়তেই প্রফুল্ল বলল, কেন আমারটা কি হল?

বাদল জানায়, তার নৌকাও নেই। কাল বিকেলেই মহেন্দ্রকে সে নৌকাটা দিয়েছিল কুটুম আনার জন্য।

বাদলের কথায় প্রফুল্লর মনে পড়ে, লালপুল থেকে মহেন্দ্রর এক বড় কুটুম আসবে আজ। কাল বিকেলেই প্রফুল্লর কাছে নৌকাটা তাই চেয়ে রেখেছে মহেন্দ্র। আজ ভোর ভোর উঠেই নৌকা নিয়ে বেরিয়ে গেছে লালপুলের দিকে। কিন্তু তাই বলে শেষ পর্যন্ত সুধন্যর নৌকা?

সমুদ্রে যাবে বলে নৌকাটা তৈরী করিয়ে রেখেছিল সুধন্য। নদীর পাড়ে জন্ম। অথচ সেই নদী ধরে গভীর সমুদ্রে যাওয়া তার হয়নি কোনোদিন। বাইশ পেরিয়ে তেইশে পড়তেই সুধন্য তাই ঠিক করল এবার সে যাবে সমুদ্রে। সেখানে গিয়ে মাছের কারবার করবে। কিন্তু বাপকে জানাতেই বাপ বলেছিল, আড়তদারদের দাদন নিয়ে সমুদ্রের গভীরে গিয়ে, এই পা নিয়ে, ঢেউয়ের মাথায় যুদ্ধ করে মাছ তুলে আনা সম্ভব নয় সুধন্যর। সুধন্য যেন তার চেয়ে জমিজমা নিয়েই থাকে। এক ফসলির দেশ। নোনা আবাদে ওই একটা ফসল করলেই চলে যাবে সুধন্যর জীবন। সুধন্য ছাড়া আর কেই বা আছে তাদের।

বাপ বলেছিল। অথচ শুধু বাপের কথাতেই খুশি থাকতে পারেনি সে। শুধু চাষবাসেই জীবনকে পূর্ণ মনে করেনি। একটা পায়ে জোর কম তো কি হয়েছে! আর একটা তো আছে। সেই পায়ের ওপর ভরসা করেই সমুদ্রে যাওয়ার ইচ্ছেটা বুকের ভেতরে বারবার তুলেছিল ঢেউ। শেষ পর্যন্ত এই ইচ্ছেটা আরও বেড়ে গেল প্রফুল্লর কাছে নৌকা যাত্রার কথা শুনে। দূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভরা কোটালের সময় প্রফুল্ল তার দলবল নিয়ে যায় জম্বুদ্বীপের দিকে। সেখানে খুঁটিতে হাজার হাজার মাছ। আড়, পারশে, ভেটকি, ভাঙন, তোপশে, পমফ্রেট আর চিংড়ি। এ ছাড়া আরও কত যে চেনা-অচেনা মাছ আছে তার ইয়ত্তা নেই। জেলেরা ধরছে, বাছছে, শুকোতে দিচ্ছে, বরফ চাপা দিয়ে বাক্সবন্দী করে পাঠাচ্ছে দূর দূর জায়গায়।

শুনতে শুনতে নেশায় পেয়েছিল সুধন্যকে। নেশা মাছের কথা শুনে নয়। সমুদ্রের গভীরে গিয়ে ঢেউয়ের মাথায় লড়াই চালিয়ে প্রচণ্ড শ্রম আর বুদ্ধি দিয়ে শিকার ছিনিয়ে আনাতেও নেশা আছে। আছে প্রচণ্ড আনন্দ। অগত্যা সুধন্য আর দেরী করেনি। প্রায় জোর করেই বাপের মত নিয়ে টাকার ব্যবস্থা করে নৌকা বানানোয় মেতেছিল। শুধু তাই নয়, নৌকাকে দ্রুতগামী করার জন্য নামখানা থেকে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড একটা আটঘড়ার মেশিনও এনে লাগিয়েছিল। তারপর নদীতে দুএকবার চালিয়ে দেখে চড়ায় তুলে রেখেছিল, ভেবেছিল, কাছবুড়িকে পুজো দিয়ে এরপর ভাল সময় দেখে একদিন বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু সেই বেরোনো আর হল না সুধন্যর। তারা আগেই পা ভেঙে বসে পড়ল আজ মাঠের ওপরে।

এখন পায়ের অবস্থা কি? কি হয়েছে কে জানে! প্রফুল্ল একটু নিচু হল। প্রায় হাঁটু মুড়ে বসে সুধন্যর ভাঙা পা-টাকে সাবধানে নামিয়ে শুইয়ে দিল

নৌকার ওপরে। পাটাতনের ওপরে কাঁথা আর বালিশ দিয়ে আগেই একটা বিছানা করে রেখেছিল বাদল। এবার সেখানে সুধন্যকে শুইয়ে দিতেই ওর বাবা এগিয়ে এল। পেছনে পেছনে আলুথালু বসনা ওর মা। খবর পাওয়া মাত্রই মাঠের দিকে ছুটে গিয়েছিল সুধন্যর বাপকে নিয়ে। আঁচলে মুখ চাপতে চাপতে সেখান থেকে এখন ফিরে এসেছে নদীর ঘাটে।

—ই প্রফুল্ল, প্রফুল্ল ইদিকে ইকবার শোন বাবা—লাঠিতে ভর দিয়ে ঘোলাটে চোখে প্রফুল্লর দিকে এগিয়ে আসে সুধন্যর বাপ। ভয় ভয় চোখে সুধন্যর দিকে তাকিয়ে প্রফুল্লকে জিজ্ঞেস করে, সুধইন্য আমার ভাল হবি তো?

প্রফুল্ল কাছে আসতে পারে না। সুধন্যকে ধরে নৌকায় বসেই উত্তর দেয়, হবে নিশ্চয় হবে কাকা। আপুনি ইত চিন্তা করবেননি। যান ঘরি গিয়ি ইখন এট্টু বিশ্রাম করুন। আমরা যাবো আর আসবো।

প্রফুল্লর কথায় বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কি বোঝে কে জানে! তবে এসব নিয়ে আর দেরী করে না প্রফুল্ল। এখন দেরী মানেই সুধন্যর ক্ষতি। প্রফুল্ল তাই বাদলের আনা ছাতাটা খোলে। সুধন্যর ভাঙা পায়ের ওপরে রোদ আড়াল করার জন্য ছাতাটা মেলে ধরে। পরে বাদলের দিকে তাকিয়ে চটপট নৌকা ছাড়ার হুকুম দেয়।

নদীর হাওয়ায়, ঠাণ্ডা বাতাসে একটু একটু করে ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে সুধন্যর। চোখ দুটোও পুরোপুরি খুলেছে। প্রথমে অস্পষ্ট, কেমন যেন ঝাপসা মতো, চোখের কোণে পিছি জমে চোখের নজর যেমন হিজিবিজি হয়, প্রথমে অনেকটা সেরকম হয়ে আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা যখন পরিষ্কার হয়ে এল তখনই সুধন্যর নজরে পড়ল মাথার ওপরে ঝকঝকে নীল আকাশে দুটো গাঙ-শালিক। উড়ছে। উড়তে উড়তে কাছে আসছে। কিন্তু গ্রীবা ঘুরিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে কি দেখছে ওরা! তবে কি কোনো নৌকাকে অনুসরণ করছে। একটু খেয়াল হতেই বুঝল, সে যাচ্ছিল মাঠের দিকে, নিজেদের জমিতে; কিন্তু এখন আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। নৌকায় শুয়ে কোথাও একটা চলেছে। কিন্তু কোথায়? কেনই বা সে নৌকায় এল! ঘাড় ফিরিয়ে আস্তে আস্তে চোখ নামাতেই সুধন্য চমকে উঠল। নৌকার ওপরে পায়ের দিকে প্রফুল্ল বসে আছে। প্রফুল্লর পাশাপাশি বাদল, অর্জুন ও অবিনাশ। কিন্তু সবাই মিলে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে! তবে কি পায়ের সেই জায়গাটায় কিছু হল?

ভাবতে গিয়ে একটু একটু করে সুধন্যর মনে পড়ল, জমিতে যাওয়ার সময়

একটা নালা পড়েছিল। লাফিয়ে পার হতে গিয়েই পায়ে হ্যাঁচকা টান লাগে। তাতেই চোখমুখে অন্ধকার লেগে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। সম্ভবত তা থেকেই পায়ের সেই জায়গাটায় চোট লেগেছে। চোটটা নিশ্চয়ই গুরুতর! না হলে কোমরের নিচ থেকে ডান পায়ের দিকটা এমন অবশ মনে হচ্ছে কেন?

পরীক্ষা করার জন্য খুব আস্তে একবার পা-টাকে টানতে যায় সুধন্য। আর তখনই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চোখমুখ তার কুঁকড়ে আসে। চোখ থেকে জল বেরিয়ে যায়। ঝাপসা চোখে প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে সে ফিসফিস করে ডাকে, প্রফুল্ল—ই প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল এগিয়ে আসে। সুধন্যকে চোখ মেলতে দেখে আগেই ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এখন কাছে গিয়ে ওকে দেখে চোখ দুটো আরও চকচকে হয়ে উঠল। নৌকায় তোলার আগে থেকেই বুঝতে পারছিল, এবার জ্ঞান ফিরবে সুধন্যর। আর সেজন্য তখন থেকেই সে লক্ষ্য রাখছিল। হঠাৎ এখন পা টেনে, মুখ থেকে জড়ানো স্বরে কি একটা আওয়াজ তুলে প্রফুল্লকে ডাকতেই সুধন্যর মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল সে।

—কি রি! কি হল রি সুধন্য! কষ্ট হচ্ছি?

সুধন্য মাথা নাড়ে। তেমনি ফিসফিস করে জড়ানো স্বরে বলে, কোথায় যাচ্ছিরি প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল ওর থ্যাবড়া আঙুল দিয়ে সুধন্যর চোখের জল মুছিয়ে দেয়। বলে, যাচ্ছি দ্বারিকনগর। তোরি নিয়ি হাসপাতালি যাবু। সিই সি জায়গাটা ফেটে গেছি রি সুধন্য। ভালোই হল এবারি তুই ভালো হয়ি যাবি। আবার আগির মতো হাঁটতি পারবি—

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেই বুঝতে পেরেছিল সুধন্য, শরীরের ভেতরে ওর লাল একটা বিষ কাঁকড়া ঢুকে গেছে। এদেশে নোনা গাঙের দুধারে অসংখ্য লাল কাঁকড়া ঘুরে বেড়ায়। এরই ভেতরে কোনো কোনোটা ভয়ংকর বিষাক্ত —গায়ে ঘন লাল রঙ, মাথার ওপরে একটা হলদে ছোট ফুল। সুধন্যর মনে হয়েছিল এমনি একটা লাল বিষ কাঁকড়া সুযোগ বুঝে কখন ঢুকে পড়েছে তার শরীরে। মাঝে মাঝে ওপরে উঠছে আবার গুড়ি মেরে নেমে আসছে নিচের দিকে—ঠিক হাঁটুর কাছটাতে। কাঁকড়াটা যেখানে যখন থাকে সেখানেই অদ্ভুত একটা যন্ত্রণার অনুভূতি।

এখনও তাই হল। কাঁকড়াটা হাঁটতে হাঁটতে বুকের কাছে এসে থমকে দাঁড়াতেই যন্ত্রণাটা হঠাৎ বুক চাড়া দিয়ে উঠল সুধন্যর। বুক চেপে ধরে সুধন্য বলল, না—নারি প্রফুল্ল। বুক আমার ভেঙে আসতিছে। এবারি বোধহয় আর বাঁচাতি পারলি না—

প্রফুল্ল বলে, ধুর কি যি সব বলিস। বাঁচবিনি কেন—! এই তো সিদিন ভটভটিটা বানালি। ওটা নিয়ে সমুদ্রি যাবি নি তুই।

সমুদ্রের কথায় চোখ দুটো সদ্য ধরা ইলিশের মতো লাফিয়ে ওঠে সুধন্যর। মুহূর্তেই আবার ম্লান হয়ে যায়। কেমন একটা আচ্ছন্ন অনুভূতি এসে সুধন্যর গলা চেপে ধরে। সুধন্য তাই উত্তর দেয় না। চুপচাপ শুয়ে মাথা কাত করে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

শীতের নদী। মরা কোটাল চলছে। নদীতে তাই এসময়ে কোনো ঢেউ নেই। মাঝে মাঝে জেলির মতো হলদে রঙের এক ধরণের গোলাকার বস্তু ভেসে বেড়াচ্ছে জলের ওপরে। শীতের শুরুতে এদিকের নদীনালায়ই দেখা যায় এদের। আবার শীত ফুরিয়ে গেলে কোথায় যে হারিয়ে যায় কেউ জানে না।

সুধন্য দেখল, ফিঙের ডিমের চেয়েও কিছু ছোট গোল গোল সেই জিনিসগুলোর মাঝে মাঝেই কি যেন একটা ভেসে উঠছে। শুশুক বোধহয়! শরীরটা উল্টে লম্বা একটা ডুব মেরে আবার চলে যাচ্ছে নদীর ওপারের দিকে।

ওপারে জঙ্গল। চন্দনপিড়ি রিজার্ভ ফরেস্ট। সেবারে ফসলের আমনের সময় আরও অনেকের সঙ্গে ওর বাবাও লুকিয়েছিল ওই জঙ্গলে। তখন জঙ্গল ছিল আরও ঘন। এমন গভীর যে মিলিটারিদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না ওদের খুঁজে বার করা। ওরাও কষ্ট করে সারাদিন সেই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতো। বেরোত রাতের অন্ধকারে। সঙ্গে থাকতো ছোট ছোট ডিঙি।

এরকমই একটা ডিঙি নিয়ে একবার সমুদ্রে গিয়েছিল ওর বাপ। সবাই বারণ করেছিল, বাধা দিয়েছিল। কিন্তু কারো কথাই কানে তোলেনি সে। ফলে সবাই ওর আশা ছেড়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল, অত ছোট ডিঙি নিয়ে আর ফিরতে পারবে না গোলক। কিন্তু যেমন গিয়েছিল তেমনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে একদিন গোলক ফিরে এল হরিপুর।

এ সব সুধন্যর জন্মেরও আগের ঘটনা। বাবার মুখে মুখেই শুনেছে। শুনেছে মাছ ধরা আর নীল সমুদ্রের বুকে দুরন্ত ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে ছোট

ডিঙি ভাসিয়ে ফিরে আসার গল্প। সুধন্য শুনত। আর শুনতে শুনতে ওর মাথায়ও নেশা চেপে গিয়েছিল সমুদ্রে যাওয়ার। একটু বড় হতেই শেষ পর্যন্ত বাবাকে ধরেছিল নিয়ে যাবার জন্য। প্রফুল্লদের সঙ্গেও যাবে বলে তৈরী হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু নানান কারণে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি ওর! শেষে এই সেদিন নিজে দাঁড়িয়ে সে নৌকা তৈরী করাল নৌকাতে মেশিনও বসাল। ভেবেছিল, দিনক্ষণ দেখে এবার সে বেরোবে। কিন্তু সেই বেরোনো বুঝি হল না আর। আবার যদি হাসপাতালে গিয়ে পড়ে থাকতে হয় তাহলে আর সমুদ্রে যাবে কবে!

সুধন্য চোখ ফেরায়।

ভটভট শব্দ তুলে জল ফেলতে ফেলতে নৌকা এখন বড় গাঙে পড়েছে। এ গাঙের নাম সপ্তমুখী। এরই একটা মুখ দুরন্ত হতে হতে জঙ্গল নদীনালা ডিঙিয়ে ওই ওদিকে সাগরে মিশেছে। জলের রঙ এদিকেও তাই হালকা নীল। পুবের রোদ পড়ে চিকচিক করে জলছে। তারই ভেতরে ভাসমান কালো কাঠের পিপে। জেলেদের লক্ষ্মী—দুএকটা গাঙ পাখি। ঢেউয়ের সঙ্গে তাল রেখে দুলছে নাচছে ভেসে বেড়াচ্ছে। চোখ না তুলেও সুধন্য এখন বলে দিতে পারে, ওই দূরে গাঙ বরাবর যে দিশারুটা দেখা যাচ্ছে ওদিকেই আছে লায়ালগঞ্জ। লায়ালগঞ্জ পেরিয়ে মহারাজগঞ্জ ও বাঘডাঙা হয়ে তারপর বকখালি। তারও ওদিকে ফ্রেজারগঞ্জ, কসতলা ডিঙিয়ে আরও আরও দূরে আছে সেই গভীর নীল সমুদ্র। বড় বড় ঢেউ আর দিগন্তব্যাপী নীলের মাঝখানে ছোট একটা দ্বীপ। যেখানে সোলেমান মাঝি তার ডিঙা সাজিয়ে বসে আছে। মাথার ওপরে হাজার হাজার গাঙচিল আর শালিক। উড়ছে বসছে ডাকছে চেঁচাচ্ছে; চেঁচিয়েই আবার মাছ তুলে নিয়ে নীল আকাশে ভেসে পড়ছে।

ভাবতে ভাবতে যেন সেখানেই চলে গিয়েছিল সুধন্য, হঠাৎ একটা অস্বস্তি এসে বুকের চারপাশে ওর ভার হয়ে বসল। বুকের বাঁদিক থেকে ডানদিকে একটা ব্যথা খেলে বেড়াচ্ছে। লাল কাঁকড়াটা কি এখানে উঠে এল এবার! হাতটা তুলে বুকের ওপরে রাখতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বেঁকে গেল সুধন্যর। চোখ থেকে আবার জল গড়িয়ে নামছে। অনেক কষ্টে তবু প্রফুল্লকে ডাকল সুধন্য। ডাকতে গিয়েই টের পেল ওর মুখের ওপরে কেউ ঝুঁকে পড়েছে। বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করছে কি যেন।

—কি রি সুধন্য, কষ্ট হচ্ছি?

না তাকালেও সুধন্য বুঝল, প্রফুল্লর গলা। প্রফুল্ল বলল, এটটু গরম দুধ খেয়ি নিবি! লিয়ে এসেছি তোর জন্যি?

উত্তরে সুধন্য কি বলে সে নিজেও বুঝতে পারে না। তবে প্রফুল্লর উত্তরটা পরিষ্কার টের পায়। 'এই তো এইস্যে পড়লাম আর এটটু কষ্ট করি থাক্।' বলে আবার মাথায় হাত রাখে সুধন্যর। চুলের ভেতরে বিলি কেটে দেয়। বুকটা মালিশ করে দেয় সাবধানে।

তখন থেকেই এরকম করছে। সুধন্যকে নজরে রাখছে। পরীক্ষা করছে আর মাঝে মাঝেই বাদল অবিনাশদের বলছে মেশিনের গতি বাড়াতে। যাতে পাঁচ-ছ'মাইলের রাস্তা খুব কম সময়েই অতিক্রম করা যায়। আবারও তাই বলল। সুধন্যর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাদলকে জানাল, বাদল, তাড়াতাড়ি কর বাদল। আর সময় লাই—

লাই মানে! বাদল চমকে ওঠে। অবিনাশকে একবার নিচু গলায় কি যেন বলে। অবিনাশ শুনেই ফিরে তাকায়। সুধন্যকে দেখে নিয়ে পাম্প মেশিনের গতি বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভটভট শব্দটা খুব দ্রুতগামী হয়ে পড়ে। নৌকা আরও জোরে ছোটে।

এদিকে চন্দনপিঁড়ি। ওদিকে লুথিয়ান দ্বীপ। ছাপান্ন হাজার একর জমির ওপর এই দ্বীপের সত্ত্ব নিয়ে বহু বছর আগে এক সাহেব তাঁর নামানুসারেই দ্বীপটার নাম রেখেছিলেন লুথিয়ান। এখানকার লোকের কথায় সেটাই এখন তমলুকের চড়া। এই চড়ার পাশ দিয়ে কত জঙ্গল আর গ্রাম-গঞ্জের পাশ দিয়ে নৌকা ছুটবে এখন সুধন্যকে নিয়ে। কিন্তু তার আগে ততক্ষণে যদি না বাঁচে সুধন্য!

ভয় পেয়ে প্রফুল্ল এবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। ভারী গলায় খুব আস্তে বাদলকে ডাকল, এই বাদল—ইদিকে আয়।

বাদলের সন্দেহ জাগে। প্রফুল্লর গলাটা কেমন ধরে এসেছে। তবে কি সুধন্য···সুধন্যর দিকে তাকাতে তাকাতে প্রফুল্লর কাছে চলে আসে বাদল।

প্রফুল্ল বলে, আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছিনি। ত্যাখ দি নি বার বার কেমন ঘুমোয়ি পড়তিছে।

বাদল বলে, ওরি জাগায়ি রাখ প্রফুল্ল। চেফ্ন যেন না হারায়।

—তা পারা যাচ্ছে নি। কষ্ট হচ্ছে বুকের ভিতরি—বলতে বলতে প্রফুল্ল আবারও সুধন্যর বুকে হাত বোলাতে থাকে। সুধন্যকে ডাকে আবার।

ডাকলেও সুধন্য আর সাড়া দিতে পারছে না। লাল কাঁকড়াটা এতক্ষণে বুকের ভেতরে যেন বিষ ঢেলে দিচ্ছে। ব্যথাটা যেন বুকের সমুদ্রে নতুন জল পেয়ে গর্ভবতী ইলিশের মতো ডিম ছেড়ে যাচ্ছে। কোমরের নিচ থেকে পায়ের দিকটা একদম অবশ। ক্লান্তি ও বিষের জ্বালায় চোখ দুটোই এবারে বুজে এল সুধন্যর।

কিন্তু এ কী! সুধন্যর বুকে হাত বোলাতে বোলাতেই চমকে ওঠে প্রফুল্ল নাকের ওপরে দুই ভুরুর মাঝখানে বাগদা চিংড়ির দাঁড়ার মতো একটা রেখা জেগে ওঠে। নৌকার মেশিন থেকে কেমন একটা পোড়া গন্ধ উঠে আসছে না? গতিও যেন কমে আসছে মনে হচ্ছে! কি জানি, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড পাম্প-মেশিন। খারাপ হতেই বা কতক্ষণ।

ভয়ে ভয়ে বাদলকে দেখাবার আগেই দেখে মেশিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে ততক্ষণে কি দেখতে শুরু করেছে অবিনাশ।

প্রফুল্ল বলে, কি হল কি রি অবিনাশ। ছ্যাখ শিগগির। দরকার হলি খানিকটা গ্রীজ দিয়ি দে।

গ্রীজের কথায় বাদল উঠে যায়। চটপট পেছন থেকে একটা কৌটো নিয়ে এসে অবিনাশের হাতে তুলে দেয়। কৌটোটা হাতে নিয়েই পাটাতনের একটা দিক তুলে ফেলে অবিনাশ। তুলতেই চমকে ওঠে। গল গল করে মেশিন থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেই সঙ্গে তীব্র একটা পোড়া গন্ধ। গ্রীজ দিলেও সমস্যার সমাধান হবে না। বরং মেশিনটা আরও খারাপ হতে থাকবে। তার চেয়ে বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।

ব্যাপারটা বুঝেই অবিনাশ বলল, নাহ্ রি প্রফুল্ল ই হবে নি। মেশিনি আগুন লাগি যাবে। তার চে দাঁড়ে টানি ইখন—।

বলতে বলতে ফস করে পাম্প মেশিনটা বন্ধ করে দেয় অবিনাশ। তারপর অর্জুনের হাতে দাঁড় তুলে দিয়ে বলে, নে অর্জুন ইবার তোর কিরামতি দিখা। জোয়ার লাই। ভাটা চলতিছে। দিখা তুই কত্ত তাড়াতাড়ি নৌকা নে যাতি পারিস।

বলে লগি হাতে সে চলে যায় পেছনের দিকে। নৌকার পাশে লগিটা শুইয়ে রেখে এবার সে হালে বসে। অর্জুনকে নির্দেশ দেয়, জোরি অর্জুন, জোরি দাঁড় টানবি। সময় কিন্তু লাই বিশেষ।

এতক্ষণ দাঁড়ের কাছেই চুপচাপ মনখারাপ করে বসেছিল অর্জুন। সুধন্য

তার অনেকদিনের বন্ধু। একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে। বই হাতে নিয়ে স্কুলে গেছে। এমন কি নদীর ধারে গাঙ শালিকের ডিম খোঁজার জন্যও কতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে; সেই সুধন্যর এমন অসুখ—ভাবতে ভাবতে মনটা খারাপ হয়েছিল ওর। নৌকার সামনের দিকে চুপচাপ বসে সে ভাবছিল তাই অনেক কথা। এমন সময় মেশিনের শব্দটা বন্ধ হয়ে যেতেই চমকে উঠল অর্জুন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা কানে গেল তার। অবিনাশের হাত থেকে দাঁড় নিয়ে অর্জুন তাই দেরী করে না। মুহূর্তেই সচল হয়ে ওঠে।

অর্জুনের পেশী দোলে। হাতের টানে দাঁড় ছিটকোয়। ছিটকানো দাঁড়ের চত্তড়া দিকটা জল কেটে উঠে যায় আবার ওপরের দিকে। আবার নামে। কালো পাথর কেটে বসানো মূর্তির মতো শরীরটা মুহূর্তেই ঘামে চকচক করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আরও গতি বাড়ে অর্জুনের।

কিন্তু সে গতির সঙ্গে যেন তাল রাখতে পারে না সুধন্য। মুখ কুঁকড়ে, চোখ বন্ধ হয়ে দেহটা বারবারই কেঁপে ওঠে। প্রফুল্ল ঝুঁকে পড়ে। ঝুঁকে পড়ে বাদল। সুধন্যর মাথায় হাত দিয়ে ডাকতে যায়। কিন্তু বাধা দেয় প্রফুল্ল। বাদলকে টেনে আনে। বলে, থাক ডাকিসনি বাদল।

বাদল বলে, আবার যি চেতন হারাচ্ছে ও। বিড় বিড় করি কি বলছে!

বলছে নয়। হাসছে। প্রফুল্ল দেখল, ঠোঁটের কোণে পরিষ্কার মৃদু হাসি। বোধহয় স্বপ্ন দেখছে এখন সুধন্য। সমুদ্রে যাওয়ার স্বপ্ন। নতুন তৈরী নৌকাটা নিয়ে স্বপ্নের ভেতরেই এতক্ষণে বোধহয় নীলসমুদ্রে পৌছে গেল সে।

আলোচনা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত কবিতা পরিচয় প্রসঙ্গে

নমিতা বসু মজুমদার

কবিতা-পরিচয়ের উৎসর্গে আছে : আজ যে সব তরুণ কবিতা লিখছেন কাল যে সব তরুণ কবিতা লিখবেন। স্বতঃই মনে হয়, বর্তমান-ভবিষ্যতের নতুন-কবিদের কথা মনে রেখেই এই বই। কিন্তু, শেষতম অক্ষরাবলীতে মলাটে মুদ্রিত বাক্যবন্ধটি আমাদের অন্য ভাবনাতেও পৌঁছে দেয়। "বাঙলা কবিতায় আগ্রহী সকলেরই অবশ্য-পাঠ্য।" অতএব, লেখক ও পাঠক দুজনের জন্যেই। দ্বিমুখী এই ভাবনাতে আমার স্বভাবতই মনে পড়ে গেল, লরেন্স ডারেলের উক্তি : "first to supply a satisfactory key to the complexities of contemporary practice in poetry, and, secondly to give a brief account of the poets writing to-day." কবিতা-পরিচয়ে দ্বিতীয় কাজটিই অধিক হয়েছে। অবশ্য সেই কবিতাই আলোচিত জটিল যার বুনুনী।

শুরু করবার আগে দু'একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমত, কবিতা-পরিচয়ের আলোচকেরা প্রায় সকলেই কবি, কয়েকজন ছাড়া। কবিতার আলোচক যখন কবিই, অনিবার্যরূপেই প্রধান হয়ে ওঠে কবিসত্তা। এক জায়গায় এদের সকলের মিল। সৃজনধর্মী সব শিল্পীই জোর দেন নির্মাণ অধ্যায়েও। এঁরা মানেন, সৃষ্টিতে নির্মাণ অসংগত হলে সৃষ্টি স্ব-স্বরূপে দাঁড়াতেই পারে না। তাই কবিতার আলোচনায় যত জোর বক্তব্যে, তত্ত্বে; ততখানিই আংগিকে। প্রতীক, চিত্রকল্প, ছন্দ-মাত্রা এবং শব্দ-উৎসে। দ্বিতীয়ত, এর

যাত্রা একটি মাত্র রেখার উত্থান-পতনে। একে ঘিরে দুই, তিন, চারের অলংকরণ। এর বিশেষত্বই এটি। পুরো বইটি যেহেতু মাত্র কোনো একটি ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা আলোচিত নয়, একটি ব্যক্তিসত্তার চিন্তা-ভাবনায় প্রকাশ ক্ষমতায় প্রকাশিত বা কিয়দংশ আবৃতও, যদিও সকলেই জানি, ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বাহ্য সত্তার সংকলন থেকেই যায়, তা গ্রহীতার জারকরসেই অখণ্ডতা পেয়ে থাকে। কোনো একজন দ্বারা আলোচিত হলে সে বই যেমন দীর্ঘলম্বমান রূপ পেয়ে থাকে এই বইতে সেরূপ দেখতে চাওয়া নির্বুদ্ধিতার নামান্তর হবে।

রবীন্দ্রনাথ॥ প্রথম দিনের সূর্য দিয়েই শুরু। শংখ ঘোষ দেখালেন, নির্মাণের গোপন প্রক্রিয়া শিল্পী স্বভাবের, অন্তরাগেই থাকে। তাই প্রচণ্ড অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি, শব্দ-বন্ধন-ক্ষমতার ঐশ্বর্যকে তবু উন্মুক্ত করে ধরলেন সূর্য এবং প্রশ্নকে গ্রন্থিবদ্ধ করে। প্রশ্ন কবিতাটিকে তিনি প্রথমদিনের সূর্যের সম্মান দেননি। এখানেই আর এক রেখা। এলেন আবু সয়ীদ- আইয়ুব। তর্ক কঠিন হোলো, শংখ ঘোষের বিবৃতির শেষ অর্ধে; শেষ দশ বছরের কবিতায় খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কত বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন তিনি। আবু-সয়ীদ-আইয়ুবের এখানেই প্রতিবাদ। তিনি দেখালেন, শেষ দশবছরেও রবীন্দ্র প্রতিভা-অমোঘ।

অলোকরঞ্জনের অনুধাবন-দৃষ্টি জোরালো সেই অংশে, নেতিবাচক অপেক্ষা ইতিবাচকে। টুকরো টুকরো না—এর শব্দগুলো যে প্রক্রিয়ায় হ্যাঁ হয়ে যাচ্ছে তারি ওপর তাঁর ক্যামেরার ক্লোজ-আপ। তোমার সৃষ্টির পথের শেষ পর্যায়ে বললেন আর সাংখ্যের জোর নয়। বেদান্ত। অলোকরঞ্জন দেখালেন। এখানেই দার্শনিক ও কবি রবীন্দ্রনাথের অন্বয় ঘটল। আমরা দেখলাম কবি সেই প্রকৃতির হাত থেকেই শেষ পুরস্কার নিলেন। যে চেয়ে আছে আরো সুন্দর, আরো শ্রেয়, আরো পরমের দিকে।

দুঃসময়ের পূর্বখসড়া পাণ্ডুলিপির যে শব্দ নিয়ে প্রমাদ, যাকে নরেশ গুহ পড়েছেন মানব, শুভময় রায় পড়েছেন সাগর, দেবেশ রায় আতসকাঁচসহযোগে সাগরই পড়েছেন। ঠিক আমার মত, সাগরই। মানব শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই মানবতার যে বিপুল বিস্তারকে ব্যক্ত করে নিরবধি দেশকালের সমাহারে তাকে ক্ষুব্ধ অজগরসম নিশ্চিত দেখেননি রবীন্দ্রনাথ। পুঞ্জ, ক্ষুব্ধ ডিসট্রেসই গর্জমান অজগর তুল্য। সে ডিসট্রেস জাগতিক হ'তে পারে, পার্থিব, হ'তে পারে অপার্থিব, স্পিরিচুয়াল। এবং রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে নন্দনতত্ত্বেরো।

বিজয়া দাশগুপ্তের অভিমতেই আমার সম্মতি, ক্ষীণচন্দ্রকলা শুক্লই। চতুর্থ স্তবকে আমরা কিছু আশায় সঞ্চারিত ছিলাম। মরণ গর্জন করলেও, তারার ইংগিত ছিল, ছিল "এসো এসো" সকরুণ আহ্বান। শেষতম স্তবকে চকিত সভয়ে দেখলাম, কবি চলে গেলেন নিখিল নাস্তিতে। শুধু একটি বোধকে নিলেন সম্বল করে। মহানভঅংগনে সত্য শুধু পাথা—পুরুষকারই একমাত্র, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

জীবনানন্দ দাশ॥ জীবনানন্দর জীবনবৃত্তান্ত প্রায় জানা নেই। অধুজ বসুর "একটি নক্ষত্র আসে" থেকে যেটুকু জানি, আমাকে হার্বার্ট হাওয়ার্থের "নোট্স্ অন্ সাম ফিগারস্ বিহাইনও" টি, এস, এলিয়টকে স্মরণ করিয়েছে। যদিও দুস্তর পার্থক্য এলিয়টের মা শার্লোটি আর জীবনানন্দর মা কুসুমকুমারীর জীবন-যাপনে। তবু একজায়গায় আশ্চর্য মিল। দুজনেই কবিতাকে ভালোবেসেছেন। দুজনেই কবিতা লিখেছেন। আর দুজনেই সঞ্চালিত করে দিয়েছেন নিজেদের ব্যর্থ-প্রেমকে অগাধ-প্রেমে পুত্রের রক্তে, আবেগে-মননে অর্থাৎ সমগ্র অস্তিত্বে। শার্লোটি গ্রাজুয়েট হবার পরেও মাত্র মহিলা বলেই ১৮৬২ তে আমেরিকার য়ুনিভার্সিটিতে প্রবেশ-অধিকার পাননি। আমাকে অবাক করেছে তাঁর লেখার ষ্টাইল—ঋজু, অলংকারহীন। মনে হয়েছে পুত্র উত্তরাধিকার নিয়েছেন মায়ের কাছ থেকেই।

Though Culture may be our corner stone
We cannot exist for culture alone
In Scholarly retreat.

জীবনানন্দে তীব্র রবীন্দ্র বিরোধিতা নেই। দুঃসময়ের অন্ধকারকে জীবনানন্দই তুলে নিয়েছিলেন। অন্ধকারের বেদনা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও আধুনিকতর ভাবে তীব্র, তীক্ষ্ণ তাঁর চেতনায়। রবীন্দ্রনাথে যে বৈদান্তিক শান্ততার প্রয়াস ছিল অহরহ, সমস্ত সুখদুঃখের তীব্রতম মধু-বিষ গ্রহণ-প্রকাশ সত্ত্বেও—না হলে কবি হওয়া যায়না, দার্শনিকই হয়ে যেতে হয় শুধু—সেই সম্ভোগান্ত শান্তের আভাস পাননি জীবনানন্দ। পরিক্রমাভংগী শব্দনির্বাচন, সংযোজন, বিন্যাস সমস্তই রবীন্দ্রনাথ থেকে এবং তাঁর সময়ের ও পরবর্তী কবিদের থেকে এতই স্বতন্ত্র।

লীলার পরিবর্তে খেলা শব্দটির ব্যবহারেই হাজার বছরের তুচ্ছতা। অলোক-রঞ্জন দেখালেন সময়ের সব আয়োজনই ব্যর্থ। দ্বারকা শব্দে কুরুক্ষেত্র ধ্বংসাবশেষের শূন্যতার উন্মোচন। এই কবিতায় তিনি আরো তিনটি কবিতার

উৎসকে রেখেছেন। শেষে তাঁরও উচ্চারণ, প্রবাদ-প্রতিম বনলতা সেনও চিরায়ত প্রতিমা নয়, তাকেও সময়, অভিজ্ঞতা ক্লান্ত করে।

গোধূলি-সন্ধির নৃত্যের সমালোচকদের টোনের মিল নেই। সকলেই আঁচড় টেনেছেন জোরালো কনট্রাষ্টরঙে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভালোলাগার চোখে সদ্যজ্যোৎস্নায় সর্বনাশপন্থী নারীদের নাচ দেখলেন, তাদের ঘিরে কজন পুরুষ। কবিতা এইটুকুই, আর যা তা কবিতার তান। নরেশবাবু কোথায়ো নৃত্যপরায়নাদের খুঁজে পেলেন না! ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়ানো প্রগাঢ়-ঠাট্টাই মনে হয়েছে। সমস্ত মিলে তাঁকে চিন্তিত, বিব্রত ও ব্যথিত করেছে। পরিব্যাপ্ত মহাবিষাদ দেখলেন অরুণকুমার সরকার। মহাকালই নীরব দর্শক। জীবনানন্দের প্যাঁচা। নারীগুলি বিলাসিনী নয়, মেধাবিনী। বিষ্ণুনীতে নরক শব্দটি নরেশ গুহের মত তাঁকেও ভাবিয়েছে। শেষকথা: ভগ্নাবশেষের মধ্য দিয়েই ম্লানজল হীরে হয় ফের। ক্রুরপথ দিয়েই যায় হরিতকী বনে। তবে কেন পরিব্যপ্ত বিষাদ? হরিতকীতে ঔষধির আশ্বাস বলেই তো জানি। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভ্যতার অবক্ষয়কেই দেখলেন; "পৃথিবীর শেষে" পর্যন্ত। হে প্রগাঢ় পিতামহীর উপস্থিতিতে ভুতুড়ে ভাব পরিব্যাপ্ত। নুমুক্ত নিস্তব্ধতা মধুকূপীঘাস—আদিম জ্যান্তজগৎ। সে জগতে যূথচারী নারীদের প্রাগৈতিহাসিক নৃত্যানুষ্ঠান, ভয়াল। এরা বিলাসিনীই। ঘোলামদ। বেশ্যালয়। হংকং বন্দরের মিলেই মিল।

কী পাইনি, কী পেয়েছির হিসেবেই দেখেছেন অদ্ভুত-আঁধারকে বিনয় মজুমদার। এলিমিনেশনে রহস্যময়তা আসে, অস্বীকার না করেও বলা যায়। কোনো কবিতা নগ্ন ঋজুতাতেই বেশী শক্তি ধরে। অবশ্য শ্রীমজুমদার একথা নিজেই বলেছেন "আবিষ্কার আছে" উক্তিতে। কবিতাটির সংযম এলিয়টকে স্মরণ করায়। অন্ধতমসাবৃত আজকের পৃথিবীতে সৎ মানুষের দাঁড়ানো যে কত ভয়াবহভাবে বেদনার,সেই বেদনার বিস্তারে এমন নিরলংকার, নগ্ন, শিশুর মত ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ সম্ভাবনাময় কবিতারই প্রয়োজন ছিল।

ঘোড়া কবিতার আলোচনায় আলোক সরকার জীবনানন্দর সময় চেতনা, ইতিহাস চেতনাকে উদ্ঘাটিত করলেন। দেখালেন রবীন্দ্রনাথের সময় চেতনার সংগে মৌলপার্থক্যটি। অখণ্ড প্রবহমানতায় বর্তমানের অতীত হয়ে যাওয়ার ধ্যানময়তা নয়—অরব বিলীনতা। যে গতিবান ঘোড়াগুলি আজ দুর্বার, আর যেগুলি দাঁড়িয়ে স্থির প্রস্তরযুগে—আবহমানের মধ্যে মূলে তফাৎ

নেই। মনে পড়িয়ে দেয় স্পেংগলারকে। সভ্যতামাত্রেরই জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু অনিবার্য।

তীর্থংকর চট্টোপাধ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন "মৃত্যুর আগে" কবিতাটির।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত॥ রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে স্নাত হয়েই তাঁকে ছেড়ে বেরিয়ে এলেন দুই কবি। একজন বৈদান্তিক চেতনাকে নিরন্তর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করালেন। অন্যজন প্রাত্যহিকতার ওপর চিরন্তন সপর্ল। কিন্তু ভাষা, ভংগী সমস্তই রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক। সুধীন্দ্র দত্তকে বুদ্ধদেব বসু য়ুরোপীয় রোমান্টিক কবি ও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপেই দেখেছেন। "নৌকাডুবি" তাঁকে মনে পড়ায় "নিরুদ্দেশ-যাত্রা" র‍্যাঁবোর "মাতাল-তরণী" ও ভালেরির "নৌচালক"কে। স্বল্পাক্ষরে গূঢ়ার্থব্যঞ্জক "নষ্টনীড়" কবিতাটিও অরুণকুমার সরকারকে মনে পড়িয়েছে "দুঃসময়" এবং ভালেরিকে। দীপ্তি ত্রিপাঠীর রঙ-বর্ণনা সুন্দর। কিন্তু, জীবনকে ভালোবেসেও যে তাতে belong করা যায় না, কবির মূল চিন্তাকে স্পর্শ করেছেন। বিনয় মজুমদার কবিতা রচনা কালে অবচেতনের লীলা আর পরবর্তীকালের অতি সজাগমনের গাণিতিক বিচার পদ্ধতির ওপর অবহিত হতে বলেছেন। "স্বয়ংবর প্রমা" এই শব্দদ্বৈতে ত্রিদিব ঘোষ পেলেন বৌদ্ধশাস্ত্রের বহুত্ব। "আত্মদীপ ভব" আপনাকে আপনিই প্রদীপ দেখাও। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু বিশ্লেষণ প্রত্যুত্তরে। অতীত এবং ভবিষ্যতের দাবী করছেন বর্তমান-সত্তায়। কাল চেতনার বিশদ-বিবরণ দেবতোষ বসুর "উটপাখী" আলোচনায়। তিনি চতুর্থ মাত্রা এনেছেন। বলেছেন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সংযোগ করতে হবে শাশ্বত অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

অমিয় চক্রবর্তী॥ ভালোবাসার ঘনত্বে ভরা বৃষ্টি। নরেশ গুহ দেখালেন প্রিয়নারী বিচ্ছেদ বেদনা। মনুজেশ মিত্র আবু-সয়ীদ-আইয়ুবের সহমত, সৃষ্টির অসীম বিরহ বেদনা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর অভিমত, শুদ্ধমাত্র প্রেমের কবিতা। সুতপা ভট্টাচার্যেরো ঝোঁক সহজে। খুব ভালো, খুব সহজ। বলে নাম, বলে নাম—কোনো বিশেষকে ঘিরেই এই আকুলতা। পরিশেষে কবি নিজেই বললেন, বৈদিক পুরুষ-সূক্তের প্রভাব মেনেছি। যদিও প্রেমের অন্তরঙ্গিত মুহূর্ত নিয়েই এই লিরিকের বিস্তার। বৃষ্টির মতই বাসা-বদল কবিতাটি। আরো সহজ, গার্হস্থ্য অনুসংগে ভরা। তুলনায় রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, এসেছেন কবি

মারিয়ান মূর। প্রাত্যহ বাণিজ্যের ম্লানতার মধ্যেই জলে উঠেছে আত্মতার অবর্ণনীয় আভা। অরুণ সেন তর্কে নেমেছেন, যেখানে উল্লেখ করেছেন অলোক-রঞ্জন রবীন্দ্র-রুদ্রাক্ষের এবং রবীন্দ্রনাথের সংগে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল বলে। তাঁর মতে তফাৎটা শুধু বলার ভংগীতে। মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় "উদ্দেশে" কবিতার আলোচনায় বললেন, মানব-অস্তিত্বের পুরো তাৎপর্য এর মধ্যে ধরতে চাইছেন। কবিতাটি খুব ছোট, কিন্তু প্রতিটি শব্দ স্বতন্ত্র মনোযোগ দাবী করে। ধ্রুব অবসানে কোন ক্ষোভ নেই—কেননা, অফুরন্ত দানে সত্তা ধন্য—যা কিছু মানব-জীবনের অমৃত সম্বন্ধ তারি প্রাপ্তির স্বীকৃতি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র॥ মুখের আলোচনায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বললেন, প্রাণেশ্বরী শব্দটি জীবন-দেবতার চেয়ে কম সুন্দর নয়।

বুদ্ধদেব বসু॥ দু'টি কবিতা আলোচিত। "গ্যেটের অষ্টম প্রণয়ের" আলোচক নরেশ গুহ, শুভময় রায়। আমার মনে হয়েছে, জীবন ও শিল্পের দ্বন্দ্বে এখানে শিল্পই জয়ী। আমার অবশ্য আন্তর-আকর্ষণ "না-লেখা-কবিতার" প্রতিই। অন্তরংগে ও বহিরংগে দুলিয়ে দিয়েছে। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সঠিক ইশারা দিয়েছেন প্রকৃতি-শিল্পের সম্পর্ক উল্লেখে। তাঁকে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা মনে পড়িয়েছে কিয়দংশে রিলকে ও বোদলেয়ারকে।

বিষ্ণু দে॥ বিষ্ণু দের কবিতার পরিচয়ে আছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুণ সেন। প্রথমেই সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় বলি, "ক্লান্তি নেই"-এর সুস্মিত উচ্চারণ এবং গভীরে অবগাহন দুই আনন্দের। একদিকে আবৃত্তি যোগ্যতা—অন্যদিকে অন্বেষণ বিপুলতায় প্রসারিত। অলোক-রঞ্জন তাঁর দার্শনিক চৈতন্যের প্রসারে "ক্লান্তি নেই" কবিতায় প্রেমিকা ও কবিতাকে একটি কেন্দ্রে এনেছেন। আর একটি যে ইংগিত অরুণ সেনের তাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যুগান্তরের প্রতীক্ষা, বিপ্লবের প্রতীক্ষা। বিষ্ণু দের মত কবির পক্ষে যুগান্তরকে এমনি মূল্যময় করে দেখাই তো সংগত। "একাদশী"তে উত্তরসূরীর প্রতি আশংকা জড়ানো অবোধ-প্রেমের উচ্চারণ। জীবন-অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ কবি পিতার ব্যাকুলতাতেই বাঁচিয়ে রাখতে চান তাদের শুদ্ধ, অপাপ-বিদ্ধ তন্ময়তাকে। জানেন অদ্ভুত-আঁধার আজ বড় কার্যকর। আজ শুভ এবং প্রেম অবজ্ঞেয়। এবং যে শিল্প পণ্য নয় সেই শিল্পও। "জলদাও" কবিতায় চমৎকার দেখিয়েছেন সমালোচক, স্ব-কবিতায় স্থিতির তুলনায় বিষ্ণু দে ও এলিয়টে। যন্ত্রণাবাহী "আমি" অহংকারে না পৌঁছে কী ভাবে পৌঁছে যায়

"আমাদের" শব্দটিতে। 'জলদাও'-এর ক্যানভাস্ বিরাট। অজন্তার গুহা-চিত্রের মত স্তরে স্তরে বিপুল বৈচিত্র্যে পুঞ্জিত, পুঞ্জিত শব্দের রেখায়, রঙে। নির্জন-বিষাদ, কমিষ্ঠ-যন্ত্রণা, কোথায়ো দাংগা, কোথায়ো প্রেম, কোথায়ো প্রকৃতি, আম্রফল, শাদায়্ই, বেল, মল্লিকা, কোথায়ো শিল্প, নৃত্যে আভংগ আনত, কোথায়ো আসন্নসম্ভবা জননী, আর কোটিসত্ত্ব-বৃহত্তে প্রিয়া। যে প্রিয়া কবিতা, সে প্রিয়া জীবন-চৈতন্য।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের আনন্দ সহজে। "প্রজ্ঞাপারমিতা" অপেক্ষা "বউ" শব্দই শ্লাঘনীয় লেগেছে। যে প্রেমিকা পত্নী হ'তে চেয়েছিলেন, তাঁরই স্মৃতি-উদ্‌যাপিত কবিতাটি। আলোচনায় পুরাণ, এলিয়ট শংকরাচার্য ও চর্যাপদের উল্লেখ আছে।

অরুণ মিত্র ॥ পত্যের দূরত্ব ও মগ্নতাকে সরিয়ে গদ্য এনেছেন। অরুণ মিত্রের এটিই প্রছন্দ। প্রবল বিক্ষোভের সংগেই ভবিষ্যতের আশা, অরুণ সেন দেখিয়েছেন কবিতাটির প্রধান সুর। এ কবিতার যন্ত্রণা প্রায় পিতৃ-হৃদয়ের অথবা পিতা সমজ্যেষ্ঠের। "আরো বলি চাই"। অনেকতো দেওয়া গেল। এ জ্বালা কখন জুড়োবে?

দিনেশ দাস ॥ জংগল ও জংগলের আদিমতা একটির পর একটি সুন্দর চিত্রকল্পে সাজানো। "শিথিল হল মানবী আবরণ"কে আক্ষরিক ও প্রতীক অর্থে দেখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। আমার প্রশ্ন, কোন জটিলতা কবির দেখায়? যে অরণ্য-আদিমে হতে পারত মানবী রূপান্তরিত হয় সিংহিনীতে, তুমির এতবড় রূপান্তরের পরেও আমি শুধু সাক্ষ্য হিসেবেই থেকে যাই কেমন করে?

সমর সেন ॥ সমুদ্র, জাহাজ-মাস্তুল, বিষণ্ণনাবিকের গান। সমর সেন রোমান্টিক, জানালেন অরুণ সেন। কিন্তু, যেন উলটে ধরা ছবি। মদনভস্ম হোক এই প্রার্থনীয় বৈদগ্ধ্য। ব্যংগ ও হাহাকার পেলাম। রোমান্টিকের আর একচেহারা প্রাণস্পন্দে স্পন্দিত আলোর ইশারা কম্পন। সেই কাপন খানি পেলাম না।

রমেন্দ্রকুমার আচার্য-চৌধুরী ॥ কবিতাটি আত্মমনস্ক একাকী এক নিঃসংগ বৃদ্ধের। পুরো কবিতার ভাষাই "সফিস্টিকেটেড্" একথাই বললেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিশব্দই অভিনিবেশদাবী করে। কবিতাটি তাঁকে অনিবার্য ভাবেই এলিয়টকে মনে পড়িয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ এক কাঠখোট্টাগাছ আর এক কালো কুচ্ছিৎ মেয়ের

কাহিনী। শংখ ঘোষের মত প্রবাদ-প্রতিম লাইনটি ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। বিনয় মজুমদার কথিত এলিমিনেশন ধাপে ধাপে মিলেছে আশ্চর্য সরল কথ্য ভাষার সংগে। পাঁজর ফাটিয়ে হাসাগাছ। কালোমেয়ে, লালহলুদ আকাশ, প্রজাপতি, দড়াম দরজা বন্ধ, গাছের মুখচাপা হাসি। দড়ি পাকানো গাছ যে ফুটপাথের পাথরেও পা ডুবিয়ে রসটানে তার মুখচাপা হাসির কথায় শংখ ঘোষ জানালেন, মেয়েটি বহির্জীবন থেকে নিজেকে খণ্ডিত করে গৃহবদ্ধ করলে গাছ হেসেছিল, সে জানে, বেদনায় ধিক্কৃত অবরুদ্ধ থেকে নয়, নামতে হয় পৃথিবীর কেন্দ্রে। ফুল না ফুটলেও আছে বসন্ত।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ স্বর্গের পুতুল একটি উদ্ভাসিত প্রতীক বলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। উজ্জ্বল আলোর নিচে কথাটি বারবার ব্যবহারে আলোর উৎস সন্ধান ইচ্ছাকে ব্যাকুলিত করে। করলেও সকলে যেতে পারেনা উৎসের সন্ধানে। যে যায় আলোর তটিনী-তীরে তার যাবার অভিসারই আমাদের আলোর প্রত্যাশাকে আনন্দ দেয়।

সিদ্ধেশ্বর সেন ॥ আলোচক অরুণ সেন। শান্তিনিকেতন উদ্‌ঘাটিত অন্তরংগে বহিরংগে। প্রতিটি সচেতন শব্দে মন্ত্রোচ্চার। যদিও সরু হালকা চালে। অরুণ সেন চমৎকার, পরিচয় করিয়েছেন "মুক্ত/অন্তর্চেতনা/বন্ধ/আমার মধ্যে সমস্ত বহির্দেশ/" এই বাক্যটির। বিনত শ্রদ্ধাতেও রবীন্দ্রজগতে স্থির প্রবেশ ঘটছে না। সবচেয়ে সুন্দর অরুণ সেনের বলা—একটি ট্র্যাজিক নাটক শেষ হোলো। মস্ত এক ছেদ। এবং "বিচিত্র আনন্দ, বাজে।"

শংখ ঘোষ ॥ আলোচক সুনীল গংগোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সুনীল গংগোপাধ্যায় প্রথমেই মেনে নেয় কবিতার কিছু লাইনের মানে থাকে, কিছুর থাকে না। এমন কি আপাত-পারম্পর্যহীন পর্যন্ত। অর্থাৎ রাগে যেন বিবাদীস্বরের প্রবেশ। এই কবিতার বিশ্লেষণে তিনি আক্ষেপই প্রকাশ করলেন একেবারে শেষ অংশটুকু ছাড়া। অলোকরঞ্জন কবিতাকে দর্শন-সিদ্ধিতে দেখতে ভালোবাসেন। তাই তাঁর মনে হয়, সুনীলরচিত ভাষ্য অগভীর। সূচনা, অন্তরা, সমাপ্তির ত্রিনীতিতে বেঁধেই দেখলেন কবিতাটিকে। মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ কবিতাকে বলেছেন গভীর তাৎপর্যময়। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। শ্রেষ্ঠ কবিতার, আর্টের লক্ষণ যদি শান্তি হয়, একবিতায় তার মন্ত্র বলেছে অন্ত্য-চরণে, বললেন মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য মেনেও এমন উক্তি কেন করলেন যা প্রায় প্রলাপোক্তি।

নারী চায় রতিরংগে আত্ম-নিমজ্জন, পুরুষ চায় প্রসার—সৃষ্টির পরিণতির। খুব হাস্যকর উক্তি নয় কি? মানুষ বা মানুষীমাত্রের মধ্যেই পরস্পর সংলগ্ন সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তর পুরুর। অলোকরঞ্জন কোনো নারীবিশেষের উল্লেখ করতে পারেন, নিশ্চিত তিনি নারী-প্রতীক নন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়॥ অশ্রুকুমার সিকদার এ কবিতায় একজন মাতালকে দেখতে পেয়েছেন, যে মনমাতালে মাতাল। সুরাক্রিয়ায় যেমন উলটপুরাণ, কবিতার লাইনে লাইনে তেমনি ওলটানো দৃশ্যপটের অফুরন্ত মেলা। ওলোট-পালোটের মধ্যেই বিবাহ মৃত্যু, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কী। বাড়ী ফেরবার সময় মাতালের চোখ সন্তের চোখ হয়ে যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়॥ আলোচক অশ্রুকুমার সিকদারই। "পান্থনিবাস" শব্দটি শুনেই তাঁর মনে হয়েছে রূপক। এও বললেন, জীবন-মৃত্যুর মধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় শেষোক্তই জয়ী। এউক্তি অতর্কিতেই বার্ণম্যানের চিত্রটিকে মনে পড়ালো। অশ্রুকুমার একবার ভেবেছিলেন আগের যাত্রীটি রবীন্দ্রনাথ, পরবর্তী ধারণা : সময়।

বিনয় মজুমদার॥ যে রহস্যময়তা কবির খুব প্রিয় তাতেই বিজড়িত কবিতাটি। আংগিকে এলিমিনেশান যথেষ্ট; জ্যোতির্ময় দত্ত অন্তরংগে এ কবিতার "তুমি" কে ঈশ্বরেই প্রযোজ্য বললেন। কবি এমন প্রেম চান, যার মধ্যে সকলেই এক হয়ে যেতে পারে : গাছ, পাখি, মাছ, মানুষ। ব্রেখটের আস্তিক বাতাসের মত তিনিও চান সবকিছু যুক্ত হোক। পরবর্তী কবিতাটি সমালোচককে বিস্ময়ে নীরবে রেখেছে বহুক্ষণ। এই বিশাল পৃথিবীতে হারিয়ে যাওয়া অনাথ বালক আমরা। ঈশ্বরকে পিতারূপে হারিয়েছি, প্রকৃতিকে মাতা রূপে।

শংখ ঘোষ থেকে সুরু করে জ্যোতির্ময় দত্ত পর্যন্ত কবিতা পরিচয়ের আলোচকদের আলোচনায় এই কথাটাই চিহ্নিত হয়ে গেল, রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে বিনয় মজুমদার পর্যন্ত জীবনের অপূর্ণতার বেদনায় বিদ্ধ। কী যেন পাবার ছিল, পাওয়া যায়নি, হবার ছিল হয়নি। সব কবিরই উদ্দিষ্ট অপূর্ণতা-অতিক্রম,অপ্রাপ্তি থেকে পৌছনো প্রাপ্তিতে। কারুর ঈশ্বরে কারুর প্রেমে, কারুর মানবতায় কারুর বা বিপ্লবে। এই পৌছবার জন্যে অবিচলসংগ্রাম, দুঃসাধ্যে বিশ্বাস, দুর্নিবার লেখনী।

প্রকাশক : দেজ পাবলিশিং। মূল্য ৩০ টাকা

ব্যক্তিগত রচনা

ফাইল ঘটিত

সুমঙ্গল বসু

টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে কত না চরিত্র, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কত না লেখক। তবে অবশ্য শুধু লেখকই নন, পাঠকও আছেন। একজন লেখেন, আরেকজন পড়েন। আবার যিনি পড়েন তিনিও দুকলম লেখেন। এইভাবে সারাদিন রাইটার্স জুড়ে লেখাপড়া চলেছে। কিন্তু পরীক্ষা নেই। আর ফলাফল? সে তো দেশোদ্ধার। প্রশ্ন হলো, এত যে লেখক, এঁরা লেখেন কিসে? কাগজে। সেই কাগজপত্র থাকে কোথায়? না, ফাইলে। গাড়ি হচ্ছে, বাড়ি হচ্ছে; পুকুর হচ্ছে, চুরি হচ্ছে; পথ হচ্ছে, পথের পাঁচালী হচ্ছে,—সবই ফাইল-জাত। যাকে বলে, 'উঠিতেও ফাইল, বসিতেও ফাইল, ফাইল এড়াইবার যো নাই।'

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে রাইটার্স বলতে করণিকদের বোঝায়। কেরাণীবাবু। অন্য দলে আছেন সাহেব অর্থাৎ কিনা অফিসার। দুয়ে মিলে করে কাজ, হারে জেতে নাহি লাজ। এই বিল্ডিং 'শতং লিখ মা বদ' প্রতিবাক্যের প্রতিমূর্তি। এখানে ফাইল বলে, ফাইল চলে। এবং সেই ফাইলের বিচিত্র গতি। কখনো প্রেমিক, কখনো পাষণ্ড। কখনো কচ্ছপ, কখনো খরগোস। খেলার প্রথম চাল ঐ করণিকের হাতে। দুই ডিভিশন করণিক—লোয়ার এবং আপার। অনেকটা রেলের বার্থের মত। 'বার্থ' বললে অমনি ঘুমের কথা মনে পড়ে যায়। কেউ উপরে ঘুমোন, কেউ নিচে। কেউ কেউ আবার জেগেও ঘুমোন। কোথায় কোনো গল্পে যেন পড়েছিলাম, একবার এক কেরাণীবাবু বারোটা

নাগাদ হাজিরাখাতা সই করতে গেলে অফিসার ভদ্রলোক তাঁকে শুধোন, 'কি, অমুকবাবু, এত দেরিতে অফিসে এলেন যে?' অমুকবাবু বল্লেন, 'স্যার। একটু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই বাজারহাট সবই···' ইত্যাদি, ইত্যাদি। তখন অফিসারটি গম্ভীর মুখে মন্তব্য করেন, 'সে কি! আপনি বাড়িতেও ঘুমোন?'

ফাইলের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রতি বিষয়ে একটি ফাইল। সেই বিষয়টি যদি পরের বছরে (এখানে বছর বলতে সাধারণতঃ আর্থিক বছর বোঝায় অর্থাৎ একটি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে পরবর্তী বছরের একত্রিশে মার্চ) পুনরাবৃত্তি হয়, তবে একই ফাইলে কাজ হতে পারে বা বছরভিত্তিক ফাইল-ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে খোলা হয়ে থাকে। ফাইল নানাপ্রকার। কোনোটি সরু, কোনোটি মোটা। কোনো ফাইল মামুলি, কোনো ফাইল জরুরি। কোনোটি সাদা ফিতে (লাল রঙ পাল্টে গেছে। তবে কি হোয়াইট টেপিজ্‌ম্?), কোনোটির কপালে স্থতুলি। এইসব ফাইলের জগতে অন্তর্ধান-রহস্য কখনো রসঘন, কখনো করুণ। একটি চিঠি উচ্চ পর্যায় থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে কেরাণীবাবুতে ঠেকলো। এবার তাঁর ফাইল পেশ করার পালা। বেশ কিছুদিন, হয়তো মাসাধিককাল, কেটে গেলো কিন্তু সে চিঠির পাত্তা নেই। টনক নড়লো 'রিমাইণ্ডার' আসায়। প্রথমে ডেকে ডেকে কেরাণীবাবুকে সিটে পাওয়া গেলো না। অবশেষে তাঁকে পাওয়া গেলো তো তিনি জানালেন ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই দেরি। স্তূপীকৃত ফাইল। এখানে সেখানে। টেবিলে, মেঝেতে। যার যার টেবিলেই তো ফাইল থাকার কথা, গেলো কোথায়? খোঁজো ফাইল। কে খুঁজবে? না যারা রাখে তারাই। 'রেকর্ড সাপ্লায়ার' বা 'নথি সরবরাহকারী' নামে একশ্রেণীর সরকারি কর্মী আছেন। তাঁরও দায় 'পাওয়া যাচ্ছে না' এই তিনটি কথায় সমাপ্ত। তারপর সেই ফাইল বেরোলো, অনেকটা যেন ফাইলের মজিতে, আরো দু-তিন-পাঁচ দিন পর। অবশ্যই কখনোসখনো ফাইল অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল জায়গায় চলে যেতে পারে, মিশে যেতে পারে। যাকে বলা হয় misplaced। আবার এমনও ঘটে যে জ্ঞাতসারে ফাইল উধাও করে ফেলা হয় কাউকে স্রেফ নাজেহাল করবার জন্য বা অন্যতর স্বার্থে।

এবার একটি গল্প শোনা যাক। গল্প না কিংবদন্তী! বা গল্প হলেও সত্যি? একবার কোনো একটি ফাইলের হদিশ মিলছে না। চিঠি এসেছে। সংশ্লিষ্ট

নথিটি অতি-অবশ্য দরকার। জরুরি তলব। উপরওয়ালা উঠতে বসতে হৈ চৈ করছেন। দপ্তরের মাথা, যিনি নৈবেদ্যর কলা, 'হালুম, হালুম' 'গেলুম, গেলুম' ডাক ছাড়ছেন। এইভাবে তলিয়ে যাচ্ছে চেঁচামেচি আর হুল্লোড়। ওদিকে চিঠিখানি অনড় অবস্থায় ঝিমোচ্ছে। সারা অফিস কয়েকদিন একেবারে তোলপাড়। কাকস্য পরিবেদনা! চতুর্থ দিনে ঐ দপ্তরের একজন দক্ষ অফিসার 'ইউরেকা, ইউরেকা' "স্যার, কাল সন্ধ্যার পর অফিস ছেড়ে সবাই চলে গেলে আমি নিজে একা রাত আটটা পর্যন্ত ধুলো ঘেঁটে তন্নতন্ন করে ফাইলটি উদ্ধার করেছি। রাতে ঘুম চলে গিয়েছিলো, স্যার। আধঘণ্টার মধ্যেই নোটসহ হাতে হাতে পেশ করছি। উঃ, বড্ড দুশ্চিন্তা ছিলো, আর স্যার, খুব খাটতে হয়েছে।" অতঃপর তার গদগদ লাজুক মুখে কিছু তারিফ গলাধঃকরণের পালা। আসল ঘটনা কি জানেন? জরুরি বলে ঐ অফিসারটির নিজের কাছেই আলমারিতে ঐ ফাইলটি ছিলো। সেটা তাঁর খেয়ালেও ছিলো। কাজেই অফিসে অন্য লোকের সাধ্য কি সে ফাইল খুঁজে বার করে? অফিসারটি কেবল তিন দিনের ঝুঁকি নিয়ে একেবারে 'হিরো'। জরুরি ফাইলের চেয়েও তিনি জরুরি। একেবারে অপরিহার্য। কি বিচিত্র!

ধরা যাক, একটি ফাইলে সব কিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব পেশ করা হলো। যাঁর কাছে ফাইল দেওয়া হলো, তিনি দুদিন সেটি তাঁর টেবিলে রেখে দিলেন। তাঁর আলস্য ফাইলে সংক্রামিত হলো। পরে একদিন ফিতে খুলে (জুতোর ফিতে খোলা যেন) নোট পড়ে তার নিচে একটি প্রশ্ন ফুটিয়ে (পেরেক ফোটার মত) ফাইলটি ফেরৎ পাঠালেন। প্রশ্নটি অবশ্য একেবারেই অবান্তর। যেমন, এক বিশেষ বিষয় বাবদ গত তিন বছরের খরচের পরিমাণ কত ছিলো? ফাইল তখন **back gear**-এ পিছু হটতে লাগলো। এভাবে ক্রমে ক্রমে তিনদিনের মাথায় ফের করণিকের টেবিলে, যথাপূর্বম্ সিদ্ধান্তহীন। তিন বছরের অঙ্ক লেখা কি চাট্টিখানি কথা? ওই জন্যেই দিন পনেরো। তারপর আবার ফাইলের ঊর্ধ্বগতি। তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে বাঁদরের ওঠা-নামার কথা মনে পড়ে যায়। এবার সেই প্রশ্নকর্তা ফাইল খুলে আত্মতুষ্টিতে মশগুল হলেন। ফাইল পাঠালেন আরো উপরে, প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিয়ে। এবার একটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে ঢুকলো ফাইলটি। যাকে বলে, ঠাণ্ডা ঘরে। ইংরেজিতে একেই বলে **cold storage**। দীর্ঘ সাত দিন। তারপর অনেক দুঃসাহসে বুক বেঁধে কেউ হয়তো মৌখিক সামান্য তাগিদ দিলেন।

আরো চারদিন। অতঃপর ফাইল বেরিয়ে যখন গুটিগুটি ফিরে এলো, দেখা গেলো আদেশ হয়েছে : সংশ্লিষ্ট কমিটির মতামত নিন। অর্থাৎ বেকসুর দেড়মাস। কারণ কমিটির বৈঠক দরকার। তার জন্য তারিখ-সময়-জায়গা নির্ধারণ, চিঠির খসড়া তৈরি, সেই চিঠি টাইপ করা এবং মূল কেন্দ্র থেকে জনে জনে চিঠি পাঠানো দরকার। অতঃপর সেই কমিটির বৈঠকে হুলুস্থুল হয়ে, বেশ কয়েক কাপ চা উড়িয়ে, সেই প্রস্তাবটিই বহাল রইলো। ততদিন ফাইল বেচারী ঢুঁটো জগন্নাথ। এবার আরো দশদিনে নির্দিষ্ট পথে (যেমন, সৌরপথ) পরিক্রমা সেরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জয়টিকা কপালে এঁকে ফাইলটি ফিরে আসলো। না, বরং 'প্রত্যাবর্তন করলো' বলাই সঙ্গত।

বড় বড় ঘরে যখন ফাইল পাঠানো হয়, তখন সেই বড় ঘরের সামনে যে একটা কুঠুরিঘর থাকে সেইখানে এক ভদ্রলোক একটি বাঁধানো খাতায় সেই ফাইলটির নামগোত্র-নম্বর ইত্যাদি টুকে রাখেন। আবার দস্তখত হয়ে বেরোনোর পর আরেকবার। একবার দেখা গেলো একখানা ফাইল ঐরকম এক বড় ঘরে ঢুকেছে কিন্তু বেরোয় নি। অথচ ঘরের ভিতরেও নেই। ম্যাজিশিয়ানের ধারালো ব্লেড খেয়ে ফেলার চেয়েও তাজ্জব অবস্থা। অনেক খোঁজাখুঁজি। বড়সায়েব বল্লেন, 'দেখুন কোথায় আছে। আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।' আরো অনেক তল্লাসী চললো, পাত্তা মিললো না। অবস্থা প্রায় এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে পুলিশে ডায়েরি করলেই হয়। অবশেষে একদিন একজন ঐ ফাইল সম্পর্কে কথাবার্তা শুনে বিকারহীন মুখে কুলুকুলুস্বরে জানালেন, 'আমিই তো ঐ ঘর থেকে ফাইলটা হাতে করে নিয়ে অমুকের কাছে দিয়ে এসেছি। তার কারণও আছে।' এর চেয়ে বেশি কিছু বল্লেন না। এই 'একজন' এবং এই 'অমুক' ফাইলটির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক বলা যায়।

একবার জনৈক অফিসার উঁচুতলায় ফাইল পাঠিয়েছিল এক ধাপ ডিঙিয়ে। অনিবার্য কারণবশত। ফাইল একেবারে ঝপাং করে ফেরৎ চলে এলো। মন্তব্য : যথোপযুক্ত খাল বেয়ে আসুন। (**Come through proper channel**-এর আরো ভালো পারিভাষিক অনুবাদ হয় না কি ?)। এছাড়া, অনেক ফাইল ফেরে 'আলোচনা করবেন' মার্কা নিয়ে। তারপর আদেশদাতার সময় আর হয় না। হয় ছুটিতে, নয় কাজে ব্যস্ত। নিদেনপক্ষে, ট্যুরে। দেরীর দায়িত্ব এখন আর তাঁর নয়, যেহেতু তিনি বল ফেলেছেন অন্যের কোর্টে। আবার এ-ও দেখতে পাওয়া যাবে যে, অনেকে নিজের কোর্টে বল রেখে খেলতেই বেশি

ভালোবাসেন। টেবিলে সারিবন্দী ফাইলের পাহাড়। অফিসার তারই মধ্যে ডুবে আছেন। খর্বাকৃতি হলে আক্ষরিক অর্থেই হয়তো তাঁর টিকি-ও দেখা যাবে না। ব্যাপার কী ? 'জানেন, টেবিলে বেশি ফাইল মানেই অফিসারের অনেক কাজ। Busy officer। একটা 'ইমেজ' তৈরি হয়। তাছাড়া, যাঁদের ফাইল আটক আছে তাঁরা দুদিন অন্তর আমার সঙ্গে দেখা করবে, হাত কচলাবে, তদ্বির করবে—সেটাই বা কম কীসের। Importance বাড়ে prestige বাড়ে। দর বাড়ে, কদর বাড়ে। দয়াদাক্ষিণ্যের সুযোগ মেলে। তাছাড়া, অনেক ফাইল থাকে, দেরি করলেই যার সমস্যা আপনা আপনি মিটে যায়। কাজেই···।' তিনি অন্য একটি কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করেন না। এই হলো আমলাতন্ত্র আর মনস্তত্ত্বের মিশেল। মোদ্দা কথা, ফাইল অনড়।

স্বাধীনতা পাওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই, পঞ্চাশের দশকে, রাইটার্স বিল্ডিংস রাজভবনের চোখের আড়ালে চলে যায়। টেলিফোন-ভবনের দৌলতে। টেলিফোন মানে তো 'হ্যালো'। আর সেই থেকে বোধহয় রাইটার্স হেলতে শুরু করলো। তবে কি কিছুই হচ্ছে না ? তা নয়। কিছু ফাইল যেমন খুঁড়িয়ে চলে, কিছু ফাইল আবার পর্বত লঙ্ঘন-ও করে। জনৈক শিল্পীর অসুস্থতা ও দুঃস্থতার খবর আসে বেলা সাড়ে এগারোটায়। নোট লিখে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফাইল চালু হয় এবং বিকেল পাঁচটায় পাঁচ হাজার টাকার চেক তৈরি। অর্থাৎ কচ্ছপের পাশাপাশি খরগোস। পাহাড়ের পাশাপাশি ঝর্ণা। কিংবা কয়লার পাশাপাশি হীরে।

তাই বলছিলাম, ফাইলস্য বিচিত্র গতি। Piles of files। কেউ বা বলেন, miles of files। একদিন হয়তো অনেক দেখে শুনে ভেবেচিন্তে কেউ ডায়াগ্‌ন্যোসিস করবেন : ফাইলেরিয়া।

গল্প

অমাতৃক

কল্যাণ মজুমদার

গেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের লম্বা ছায়া দেখেছিল। দেখতে চেয়েছিল স্কুল বাড়িটা। চোখে পড়েছিল নিজের ছায়া। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে তিনটি সিগারেটের সঙ্গে ভেতরের জমা বাষ্প উড়িয়ে দেবার পর অভী লক্ষ্য করে, এখন আর ছায়া নেই। ছায়া গুটিয়ে যাচ্ছে নিজের দীর্ঘ শরীরে। একটুকরো কেবল এখনো কুঁকড়ে পড়ে আছে পায়ের কাছে। লজ্জায়, ধিক্কারে। যে লজ্জা ও ধিক্কার এবং মিহি আর্তনাদ নিজের মধ্যে দামাল দাঁড় বাইছে, তার ভার ও যন্ত্রণা নিয়ে নিজেকে কোথায় লুকোবে? ছ'ফুট তিন ইঞ্চি শরীরটা এক লহমায় সযত্নে তৈরি স্বপ্ন আশা ও বিশ্বাসের মিনার থেকে ধ্বসে পড়ে লিলিপুট হয়ে গেলেও শরীরের আয়তন আড়াল করার উপায় জানা নেই। ভরা দুপুরের নির্দয় রোদে পুড়তে পুড়তে অভীর মনে হলো রাস্তার প্রতিটি মানুষের আঙ্গুল ওরই দিকে। যে-আঙ্গুলের ডগা থেকে ছিটকে আসছে ঘৃণা, অবজ্ঞা, উপহাস—ঐ সা-জোয়ান লোকটা যা খুঁজতে গিয়েছিল!

অপমানের রোদ আর আত্মধিক্কারের দাহ ক্রমশ অভীর শিরায় ধমনীতে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে কর্কট গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। চোখে জ্বালা, কণ্ঠা শুকনো। চেষ্টা করেও জিভের ডগায় থুথু জমাতে পারে না। নিজের ভেতরে দাউদাউ ক্রোধ। নিজের প্রতি ক্রোধ। এই মূর্খামির কী মানে হয়? কেন করব এই ভুল? কী দরকার ছিল তেইশ বছর বাদে যাদুঘরের মমি জীবন্ত করার জন্য সাত সমুদ্র পেরিয়ে উড়ে আসার? স্পন্দ ব্যবসা, সুন্দর অ্যাপার্টমেণ্ট টগবগে

বন্ধুবান্ধব ও তরতাজা নারী নিয়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল নিউ ইয়র্কের জীবন। অনায়াসে বয়ে যাচ্ছিল সময় দিন, মাস, বছর। কোথাও দীর্ঘশ্বাস ছিল না। ছিল না কোথাও কোনো অলক্ষ্য ছায়ার কটাক্ষ। শুধু পরপর তিনদিনের স্বপ্নঘোর, দূর-শৈশবের মায়া-ডাক দিগন্তের ওপার থেকে ভেসে আসা নম্র স্বর-টুটুন—টুটুন—সম্মোহিত করেছিল। নইলে, বর্ষীয়ান রজতদা ঠিকই বলেছিলেন, যেওনা, অভী, যেওনা। স্মৃতির উজানে গিয়ে কোনো লাভ নেই। দুঃখই পাবে শুধু।

রজতদা জানতেন না, কী তীব্র মায়া-আকর্ষণে ও ছুটে এসেছে। কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন তিনি। মানুষ সত্যিই শৈশবে ফিরতে পারে না! স্মৃতির দাসত্বে অসহায় বন্দী থাকাই নিয়তি। জীবনে কোনো নিয়ম অনুশাসন না-মানা অভী এই একবার প্রথমবার নিয়তির তাড়িত হয়ে আপাদমস্তক জলতে থাকে। জুনের দুপুরের গরম হল্কা রক্তস্রোতে উদ্দাম ছোটাছুটি করে।

সামনে একটা খালি ট্যাক্সি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল অভী। ড্রাইভারের পিছনে বসে জানালার কাঁচ তুলে দিতে দিতে' ভাবলো, কাঁচগুলো রঙিন হলে ভালো হতো। কেউ দেখতে পেত না তবে। সার্কুলার রোডের হোটেলের দিকে যেতে বলে সিগারেট ধরালো অভী।

এগারো বছর পর কলকাতায় এসেছে। এত বছরে কলকাতা কতটা বদলেছে, চেনা রাস্তা বাড়ি মানুষ এখনো চেনা আছে কিনা তা-নিয়ে ওর কোনো কৌতূহল নেই। কলকাতা জাহান্নামে যাক। ছয় থেকে যোল—এই দশ বছরে অন্তত তেত্রিশবার বাড়ি বদলাতে হয়েছিল। বাবা মানুষটির ক্ষমতা ছিল না নিয়মিত ভাড়া দেবার। রাসবিহারীর চার ঘরের ফ্ল্যাট থেকে বেলগাছিয়ার এক ঘর বস্তি পর্যন্ত নানা আকার ও প্রকৃতির নানা ঘরে জীবনের দশটি বছর যে-ভাবে ছাড়িয়ে রেখে গেছে তার জন্য পিছুটান থাকার কোনো কারণ নেই। যোল বছর বয়েসে, সবে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ছে, বাবার বন্ধু সুহাসকাকা অভীকে নিয়ে যান প্রথমে ইয়োরোপে তারপর আমেরিকা। ঐ মানুষটির কাছে আমরণ কৃতজ্ঞ থাকবে অভী। ও দেশের নিয়ম মতন সুহাসকাকা ওকে জীবনের পথ চিনিয়ে দিয়েছেন, সহিস হবার চেষ্টা করেননি। অভী নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে নিজের মতন বাঁচার আয়োজন করে নিতে পেরেছে। সুহাসকাকা এখন কোথায় জানা নেই। পিছু-ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ওর স্বভাব নয়। কেবল, বাবা—থাক—ঐ মানুষটির কথা এখন ভাববে না অভী।

এই শহরেই কোথাও আছেন। নোট বুকে ঠিকানা লেখা আছে। প্রতি মাসে বাবাকে কিছু ডলার পাঠাতে কখনো ভুল করেনি। বাবা চিঠিও লেখেন। অভী কখনো পড়ে, অনেক সময় পড়ে না। চিঠি লেখার অভ্যাসই করেনি।

কাল এয়ারপোর্টে কাস্টম এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে এসে মনে হয়েছিল, এগারো বছর এই শহর স্মৃতিতে ছিল না। কোথায় থাকবে, কোথায় গিয়ে উঠবে কিছু ভাবতে পারেনি। এয়ারপোর্টের দেয়ালের বিজ্ঞাপন থেকে হোটেলের নাম পেয়ে যায়। ট্যাক্সিওয়ালাকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পেরেছিল। আশ্চর্য, একবারও বাবার কথা মনে পড়েনি।

হোটেলে নোটবুক হাতড়ে ছোটমাসীর ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে নিজের নির্বুদ্ধিতায় হেসে ফেলে অভী। যাকে খুঁজবে বলে নিউইয়র্ক থেকে উড়ে এলো, তার খোঁজ কীভাবে পাবে তা-ই ভাবেনি। কীভাবে শুরু করবে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে ছোটমাসীর কথা। দু চারবার গিয়েছিল যেন, দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি কোথাও থাকতো—সেও প্রায় চোদ্দ-পনের বছর আগে। এখনো ওরা ওখানে আছে কিনা জানা নেই।

নোটবুকে ঠিকানা পাওয়া গেল না। শুধু পনের বছর আগের আবছা স্মৃতি নির্ভর করে ও অনুমান শক্তি দিয়ে তিনতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়াতেই মনে পড়ল, ঠিক বাড়িতে এসেছে। পনের বছরেও আধ ভাঙা পাঁচিলটা অবিকল রয়েছে। ঐ পাঁচিল থেকে পড়ে হাঁটুর কাছে অনেকখানি কেটে গিয়েছিল। সে-দাগ রয়েছে এখনো। এইসব স্মৃতি কখনো মোছে না।

দোতলায় উঠে কলিংবেল টিপতেই যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে দেখে স্বস্তির শ্বাস অভীর বুক বেয়ে উঠে আসে। স্মৃতির অন্ধগলিতে ঝাড়বাতি জ্বলে। শরীরে অনেক বদল সত্ত্বেও ছোটমাসীকে চিনতে একটুও ভুল হয় না। ছোটমাসীর চোখে জিজ্ঞাসা।

—ছোটমাসী, আমি টুটুন। চিনতে পারছ?

ছোটমাসী স্মৃতি হাতড়ান। টুটুন—কে টুটুন—সে তো ছিল একটা বাচ্চা ছেলে রোগাটে, বয়েসের তুলনায় গম্ভীর। সামনে দাঁড়িয়ে এক বিশাল চেহারার পুরুষ। পেটানো শরীর, ঠোঁটের ওপর মোটা গোঁফ। মাথায় অকাল টাকের আভাস। মুখের সপ্রতিভ হাসি বড় বড় চোখে ছলকে যাচ্ছে। এ কী ভাবে টুটুন হবে! পনের বছর যার অস্তিত্ব ছিল না সে আবার কী ভাবে ফিরে এল!

অভী আবার বললো, বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যি ছোটমাসী, আমি টুটুন—আমার বাবা হিমাদ্রি রায়চৌধুরি—

আর বলতে হয়নি। ছোটমাসী ওকে বুকে টেনে ভেতরে নিয়ে যান—ওঃ টুটুন! তুই কত বড় হয়ে গেছিস—কোথায় ছিলি এতদিন—

উচ্ছ্বাসে আবেগে ছোটমাসীর গলা অসংখ্য প্রশ্ন, অভিযোগ অভিমানে কেঁপে ককিয়ে ভারি হয়ে ওঠে। অভীকে ঘিরে ধরে নানা বয়েসী মাসতুতো ভাই-বোনেরা। সাতজন—অভী গোনে। একজনেরও নাম মনে নেই ওর। নিউইয়র্কে থাকে শুনে ওদের চোখে বিস্ময় লোভ ও ঈর্ষা খেলে বেড়ায়। ওর সাট প্যাণ্ট জুতো রুমাল কথা বলার ভঙ্গী সবই মাইক্রোস্কোপের তলায়।

প্ল্যান ছিল না তবু হোটেল থেকে বেরুবার সময় শেষ মুহূর্তে কয়েকটা পারফিউম, কলম, সাবান পকেটে পুরে নিয়েছিল। সেগুলো বিলিয়ে দিয়ে অভী বললো, বাড়ি খুঁজে পাবো কিনা বুঝতে পারছিলাম না। সেজন্য বিশেষ কিছু সঙ্গে আনিনি। ঠিকানাও মনে ছিল না।। আন্দাজে খুঁজে খুঁজে এলাম।

—কবে এসেছিস?

—আজই।

—কতদিন থাকবি?

—দেখি।

—বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না, ছোটমাসী, তোমার কাছেই প্রথম এলাম।

ছোটমাসীর চোখে খুশির ঝিলিক দেয়। গাঢ় স্নেহে বলেন, হোটেলে উঠেছিস কেন? এখানে চলে আয়। কদিন থাক আমার কাছে। একটু না হয় অসুবিধে হবে। তাবলে বাড়ি ছেড়ে হোটেলে থাকবি!

অভী হাসে—কি ভরসায় আসি বলো, তুমি তো চিনতেই পারোনি।

লাজুক স্বরে ছোটমাসী বলেন, আমি ভাবতেই পারিনি। কত বছর হয়ে গেল! জামাইবাবু তো কোনো খোঁজ খবরই করেন না—শেষ লাইনে অভিমান গাঢ় হয়ে ঝরে।

একটু পরে চা-মিষ্টি পর্ব শেষ করে অভী বলে, ছোটমাসী, তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকার আছে। প্রাইভেট।

ভ্রূ কুঁচকে ছোটমাসী ওর দিকে তাকান। কিছু ভাবেন যেন। তারপর বলেন, আয়।

অভীকে সঙ্গে নিয়ে ছোটমাসী পেছনের বারান্দায় চলে যান। এক চিলতে বারান্দায় দড়িতে শুকোতে দেওয়া জামাকাপড় ঝুলছে। এক পাশে কয়লার স্তূপ। জামাকাপড় সরিয়ে শোবার ঘর থেকে ছুটো মোড়া বের করে বলেন, বোস।

অভীর মুখোমুখি বসে জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকান ছোটমাসী।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে অভী বলে, তোমার সামনে সিগারেট খেলে কিছু মনে করবে নাতো?

—না, না। তুই খা। আজকাল এসব আর কে মানে!

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অভী ধূমল আকাশ দেখে। নিচে কেউ উনুনে আগুন দিয়েছে, তার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে বাতাসে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। টেলিফোনের তারে তিনটি কাক কুটুম্বিতায় ব্যস্ত।

ছোটমাসী বললেন, বল কী বলবি।

গলা পরিষ্কার করে ঠোঁট কামড়ে ছোটমাসীর দিকে তাকায় অভী। শরীরে যদি ভাঙচুর কম থাকত; শাড়িটা হতো দামী ও ঝকঝকে, সচ্ছলতার মিহি লাবণ্য যদি থাকত মুখে তবে ছোটমাসীকেও ঠিক দীপকের মায়ের মতন লাগত। দীপকের মাকে দেখেই তো আচমকা বুকের ভেতরের বন্ধ দরজায় কড়া নড়ে উঠল। তারই রেশ ধরে উড়ে আসা।

অভী বললো, ছোটমাসী, ইয়ে—মানে আমার মার কোনো খবর জানো? ঠিকানা,—কোথায় আছেন—

আমূল চমকে উঠেন ছোটমাসী। অবিশ্বাসের চোখে তাকান ওর দিকে। দশ-বারো বছরের ছেলে যা কোনোদিন জানতে চায়নি, যার কথা কখনো উচ্চারণ করেনি, আজ হঠাৎ এতদিন পরে সাতাশ-আটাশ বছরের জোয়ান ছেলে এ-প্রশ্ন করছে কেন? ছোটমাসী শঙ্কিতবোধ করেন। নিশ্চয় আবার কোথাও কোনো গোলমাল ঘটেছে। কিংবা হয়ত জামাইবাবুর—! তিনি আর ভাবতে পারেন না। কিন্তু বুকের মধ্যে দমকলের ঘণ্টা শুনতে পান। তাঁর মাথার মধ্যে তেইশ বছর লম্বা একটা মেল ট্রেন হু হু ছুটে যায়।

আঁচলে মুখ মুছে ছোটমাসী বললেন, হঠাৎ মার কথা কেন, টুটুন? কী দরকার তোর?

মা সম্পর্কে অভীর কোনো স্মৃতি নেই। বা কেবল একটি স্মৃতিই আছে। তবে সেটা মার না ঠাকুরমার তা ও নিশ্চিত ভাবে জানে না। গত কয়েকদিন ধরে বন্ধ দরজার কড়া নাড়া শুনতে শুনতে ও সেই স্মৃতিটাকে মার বলেই মেনে

নিয়েছে। কিন্তু মুখটা মনে না-পড়ায় স্মৃতির ছবিটা কিছুতেই স্পষ্ট হলো না।

স্মৃতি নেই যেমন, তেমনি মা সম্পর্কে জানেও খুব কম। বা বলা যায় কিছুই জানে না। কেবল জানে ওর চার বছর বয়েসে মা বাবাকে ছেড়ে চলে যান। শৈশবে শুনত, হারিয়ে গেছেন। কৈশোরে জেনেছে, মা চলে গেছেন অন্য এক পুরুষের সঙ্গে। কলঙ্কিনী মার কথা কেউ উচ্চারণ করত না। যে দশ বছর বাবার সঙ্গে ছিল, বাবা কখনো মার নাম করেননি। যেন টুটুনের মা বলে কেউ কখনো ছিল না। মার কোনো ছবিও দেখেনি অভী।

যে দু'বছর ঠাকুরমার কাছে ছিল তখন ঠাকুরমার কথা শুনে পাঁচ-ছ' বছরের ছেলেটির মনে জমা হয়েছিল তীব্র অভিমান। বাবার সঙ্গে একা থাকতে থাকতে সেই অভিমান বদলে হয় রাগ। কেন হয়, জানে না। বাবা ভালো মন্দ কোনো কথাই বলতেন না। অভীর মনে পড়ে না বাবা কখনো—একবারও—মার উল্লেখ করেছেন কিনা। অভীও শিখে গিয়েছিল মা-নামক সম্পর্কটিকে অস্বীকার করতে। যেন মা-বিহীনই এসেছে পৃথিবীতে। যেমন কাকা-জ্যাঠা ছিল না, তেমনি মা-ও।

না, কোনো অসুবিধে হয়নি। জীবনের কোথাও কিছু কম পড়েছে, তাও মনে হয়নি। মনে হবার সুযোগও ছিল না। বাবার সঙ্গে থাকার সময় বেঁচে থাকাটাই ছিল ভীষণ জরুরী। বিদেশে গিয়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নেবার তাড়না ছিল এত প্রবল যে স্মৃতির উজানে ধাওয়া করা সম্ভব হতো না। কিন্তু হঠাৎ দীপকের মাকে দেখে—

সপ্তাহ খানেক আগে দীপকের অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিল। জ্বরে বেহুঁশ দীপকের বিছানার কাছে ওর মা। চোখে উৎকণ্ঠা। স্নেহের আঙুল ছেলের মাথায়, শরীরে। একটা ছবি অভীর মাথায় গেঁথে যায়। ছবিটার কিছু অংশ ম্যাডোনার বাকিটা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের। ছবিটার নাম—মা। মাস ছুয়েক আগে ও নিজে অসুখে পড়েছিল। কোনো মমতার হাত ও পায়নি। পেশাদার নার্সিং পেয়েছিল। কষ্ট হয়নি কিছু। অথচ আরো যেন কিছু পাওয়ার ছিল। দীপকের মাকে দেখে মনে হলো যা পাওয়ার ছিল তা ও পায়নি কোনোদিন।

এতবছর বাদে হঠাৎ একথা কেন মনে হলো জানে না। হঠাৎ কেন বুকের মধ্যে মা-মা ডাক বাজতে লাগল তাও জানে না। পরপর তিনদিন স্বপ্ন দেখলো, মা যেন ওর বিছানার কাছে এসে বসেছেন, যেন মাথায় হাত রাখছেন। কিন্তু ও কিছুতেই মার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। জেগে উঠলেই দূর অস্পষ্ট স্মৃতির ছবি

মাথায় ঘুরতে থাকে।

সন্ধেবেলা পুকুর থেকে হাঁস উঠিয়ে যেন অভী ওদের ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পথে লাউ—বেগুনের ক্ষেতে হাঁসেদের লুকোচুরি খেলা। চার বছরের বালক পেছন পেছন ছুটছে। আবছা অন্ধকারে, গোধূলির মায়ায় একটা স্নেহার্দ্র স্বর—টুটুন—টুটুন—টুটুন—। বালকটি বেগুন গাছের ফাঁকে ফাঁকে হারিয়ে যাচ্ছে। এক-একবার ডেকে উঠছে হাঁস। সেই সঙ্গে টুটুন—টুটুন—। টুটুনের গাল ভরা হাসি। চৈ-চৈ-চৈ—, চল—চল—।

অভীর ধারণা ঐ ডাকটা মার। এ ছাড়া মার কোনো স্মৃতি নেই ওর। তবে ডাকটা ঠাকুরমারও হতে পারে। ও অবশ্য বিশ্বাস করে ওটা মারই।

কিন্তু মুখ—মার মুখ তো মনে পড়ে না। বুকের মধ্যে অবিরাম কড়া নাড়া। হঠাৎই স্থির করে, মাকে দেখতে যাবে।

এখন এই পরিণত বয়েসে আর অভিমান নেই রাগও নেই। মা বাবাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তাতে কী হয়েছে! এখানে তো হরদম হচ্ছে। ওর অজস্র বন্ধু-বান্ধব আছে যাদের মা-বাবার ডিভোর্স হয়ে গেছে। সেই মা-বাবারা দুজনেই আবার বিয়েও করেছেন। সম্পর্ক মানে হাতকড়া নয়। জীবন অনেক বড় ব্যাপক ব্যাপার। সেখানে ঝড় আছে, ঢেউ আছে, কূল আছে, কূল ভেঙে কূল গড়া আছে। নদীও খাত বদলায়। চড়া পড়ে। নতুন চর ওঠে। নিজেও কত মেয়ে বদলেছে।

তাহলে অভী কেন মার মুখ দেখবে না? কেন জানবে মা-নামক সম্পর্কটির সঠিক মানে? ওতো কিছু চাইবে না। মাকে দেখবে, জানবে। তারপর চলে আসবে।

রজতদা বলেছিলেন, যাসনে অভী। ওটা ভারতবর্ষ। বাংলাদেশ। আমেরিকা না! শুধু শুধু দুঃখ পাবি।

—কেন রজতদা?

—এখানকার র‍্যাশনাল চিন্তা ওখানে চলে না। ওখানে গেলে তুইও বাঙালী হয়ে যাবি। তোর ঐ আমেরিকান পাসপোর্ট বাক্সে পড়ে থাকবে, কাজে লাগবে না। বরং বেশি করে ক্লীনেক্স নিয়ে যাস।

—কেন? ক্লীনেক্স কেন?

—চোখ মুছতে লাগবে।

নতুন গার্লফ্রেণ্ড অ্যাঞ্জেলা বলেছিল, য়ু মাস্ট বি ক্রেজী ওভী!

অভী হেসেছিল, ক্রেজী নাহলে তোমার সঙ্গে শুই!

—তার মানে?

—সিম্পল। উহমেন আর অল বিচেস! ক্রেজী নাহলে কোনো পুরুষই মেয়েদের সঙ্গে শুতো না। ক্রেজীনেস ইজ হোয়াট কীপস য়ু লাইফ মুভিং।

—য়ু বাস্টার্ড।

—নো। আমি বাস্টার্ড নই। আমার বাবা আছেন তাঁকে আমি জানি, চিনি। আমি মাকে খুঁজতে যাচ্ছি। মা-হীন সন্তানকে জারজ বলে না। তাকে বলে মাতৃহীন। আমি মাতৃহীনও নই, মা-হারা। সেই হারানো মাকে খুঁজবো আমি। জাস্ট ফর ওয়ান্স।

—কেন? এত বছর বাদে হঠাৎ—কেন?

অভী উত্তর দিয়েছিল, যাতে মৃত্যুর আগে যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর মুখটা মনে করতে পারি। মাকে অন্য আর কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো, বলো!

ছোটমাসী বললেন, কিরে বললি না, মানে তোর কী দরকার!

অভী বলে, ছোটমাসী, আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু মার সঙ্গে আমার একবার দেখা করা খুব দরকার। শুধু এজন্যই আমি নিউইয়র্ক থেকে এসেছি।

—তোর বাবা জানেন? তাঁকে বলেছিস?

—না। তোমার কোনো ভয় নেই, ছোটমাসী। আমি স্রেফ মার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবো।

—শুধু শুধু কেন—

বাধা দিয়ে অভী গলা খাদে নামিয়ে বললো, ছোটমাসী এত বয়েস হলো, এখনো আমি মাকে জানবো না, চিনবো না?

কী যে ছিল ওর গলায় ছোটমাসীর চোখের কোনে জলবিন্দু জমে। তিনি আর কিছু বলতে পারেন না। কেবল বুকের ভেতরে অসহনীয় কষ্টের উথলে ওঠা টের পান। গভীর স্নেহে ও মমতায় ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। তাঁর কণ্ঠা টনটন করে।

ঠোঁট কামড়ে আঁচলে চোখ মোছেন ছোটমাসী। বলেন, টুটুন, রাঙাদির সঙ্গে আমাদেরও কোনো যোগাযোগ নেই। কোথায় থাকে তাও জানি না। শুধু জানি যাদবপুরের কাছে ইস্ট-এণ্ড গার্লস স্কুল আছে—সেখানে পড়ায়। আর—

—আর কি ছোটমাসী ?

—সেই ভদ্রলোককে বিয়ে করেছে।

—ওঁর এখনকার নাম ?

—মালবিকা চ্যাটার্জি।

ট্যাক্সি হোটেলের চত্বরে ঢুকতেই নিজের ভাবনা আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠল অভী। ভাড়া মিঠিয়ে, কাউন্টার থেকে চাবি নিয়ে সোজা নিজের ঘরে।

এখনো ঝাঁঝাঁ করছে মাথা। এখনো রক্তের মধ্যে রৌদ্রের তাপ।

ক্ষুব্ধ হাতে জামা প্যান্ট খুলে ঘরময় এলোমেলো ছুঁড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দাঁড়িয়ে রইল অভী। কোনো একটা ওয়ার-ফিল্মে দেখেছিল, একটা উলঙ্গ বাচ্চা ছেলে ব্রীজের কাছে দাঁড়িয়ে ব্রীজ পেরিয়ে-আসা প্রত্যেক নারীকে জিজ্ঞেস করছে—তুমি কি আমার মা? সবাই মাথা নেড়ে সরে যায়। বাচ্চাটার জিজ্ঞাসা ফুরোয় না।

দুহাতে মুখ ঢাকে অভী। চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে—যা এজীবনে কখনো করেনি। কান্নারও কোনো স্মৃতি নেই ওর। বেঁচে থাকার হৈ চৈ-টাই শিখেছে, চোখের জলে যে সান্ত্বনার তৃপ্তি আছে তা ও জানে না।

ফ্রিজ খুলে বীয়ারের বোতল বের করে সরাসরি বোতল থেকে গলায় ঢালে। আধবোতল ঢক ঢক করে শেষ করে। বুক যেন পুড়ছে। ঘরময় পায়চারি করতে করতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল অভী। আটতলার কাচের জানালার বাইরে কলকাতা পুড়ছে। হোটেলের গেটে নারীপুরুষের আনা-গোনা। সামনেই সারি বাঁধা ট্যাক্সির হলদে ছবিগুলো রোদের ওম নিচ্ছে। অভীর চোখ যায় গেটের ডানদিকে বাসস্ট্যাণ্ডে। ফুরফুরে ছাতা হাতে এক ঝাঁক মহিলা। ওর মনে হলো দু'একজন চোখ তুলে ওরই দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসিতে ফেটে পড়ছে। ওরা কি পরিহাস করছে ওকে নিয়ে।

অভীর খেয়াল থাকে না ও উলঙ্গ। হাতে বীয়ারের বোতল। পুরো পর্দা সরিয়ে ও টানটান দাঁড়ায়। মাথার মধ্যে আগুন। ও চিৎকার করে—এই খানকিরা—তোদের মুখে আমি ইয়ে করি। সব শালী তিনপয়সার বেশ্যা। অভীর ইচ্ছে করে তরল ক্রোধ ছিটিয়ে দেয় সমস্ত নারীর মুখে।

এক মুহূর্ত দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করে অভী। সটান দাঁড়িয়ে সব নারীর

মুখে তরলপৌরুষ ছুঁড়ে দিচ্ছে আপন গোপনাঙ্গ থেকে। সব মুখগুলো পুঁজমাখা, ঘেয়ো। হা হা হা হা শব্দে হেসে ওঠে অভী। দারুণ মজায় ঘরজুড়ে হেসে বেড়াতে থাকে ও। হাসির তোড়ে শরীর দোলে। এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘর থেকে ওর চিৎকার যেমন বাইরে ভেসে যায়নি তেমনি হাসির শব্দও বাইরে পৌছয়নি।

এতক্ষণ উলঙ্গ থাকার পর অভী অনুভব করে ত্বকে হিম ছোঁয়া লাগছে। ঘরের বাতাসে ঈষৎ অতিরিক্ত মেদ। ওর স্নায়ুতেও তার সংক্রমন লাগে। তোয়ালে জড়িয়ে ফ্রিজ খুলে আরেক বোতল বীয়ার বের করে আবার ও সরাসরি বোতল থেকে গলায় ঢালে। অনেকটাই শেষ করে দম নেবার জন্য থামে। বীয়ারের ঠাণ্ডা স্বাদ সারা শরীর দিয়ে অনুভব করে অভী। ঘনঘন চুমুকে বোতল শেষ করে আরেক বোতল বের করে। ধীরে ধীরে ভেতরের উত্তাপ নিভে আসে। ক্রমশ নিজেকে আবার একটা গোটা মানুষ মনে হয়।

বাথরুমে ঢুকে বাথটাবের কল খুলে দেয় অভী। টাব ভরে গেলে তৃতীয় বীয়ারের বোতল নিয়ে অভী নিজেকে টাবের ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দেয়। টাবের ধারে মাথা রেখে বীয়ারের বোতল চুমুক দিতে দিতে চোখ বোজে। সারা শরীরে অবসাদ। মগজে ক্লান্তি। কিন্তু টাটকা স্মৃতি চোখের সামনে দৃশ্যগুলো হাজির হয়।

অভীর সবকিছুই চটজলদি। উঠল বাইতো বেগমপুর যাই। তারপর যা হয় হোক। গতকাল ছোটমাসীর কাছে থেকে খোঁজ পাবার পর আর অহেতুক দেরি করেনি। শুধু অপেক্ষা করেছে সকালের।

ট্যাক্সি ধরে যাদবপুর গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে ইস্ট এণ্ড গার্লস স্কুলে পৌছায় সাড়ে দশটা নাগাদ। স্কুলের অফিসে জিজ্ঞেস করতেই জবাব পায়—মিসেস চ্যাটার্জি এখন ক্লাসে আছে। দশটা পঁয়তাল্লিশে শেষ হবে।

বুড়ো মানুষটি একটা চেয়ার দেখিয়ে বলেন আপনি বসতে পারেন।

চেয়ারে বসে সিগারেট ধরায় অভী। ঘনঘন ঘড়ি দেখে। এইসব মুহূর্তে সময় অচল হয়ে পড়ে।

বুড়ো মানুষটি নানা প্রশ্ন করে—উনি কে হন? স্কুলে এলেন কেন? কোথায় থাকেন?

—উনি আমার মা। বলতে গিয়েও কথাটা গিলে থেমে যায় অভী। এত বড় ছেলে মার খোঁজে স্কুলে আসবে কেন! আর ভদ্রমহিলা কি চিনতে পারবে?

না-পারলে? সে বড় অস্বস্তির ব্যাপার হবে। নিজের জন্য নাহলেও তাঁর জন্য। তাঁকে ও বিপন্ন করবে না।

বললো, বিদেশে থাকি। হঠাৎ এসেছি। বহু বছর দেখা হয়নি। তাই একটু দেখা করে যাওয়া।

ওকে স্বস্তি দিয়ে বুড়ো নিউইয়র্কে ইলিশ মাছ পাওয়া যায় কিনা এবং তারপরেই সি-আই-এ ব্যাপারটা কি—এই নিয়ে আলোচনা শুরু করে।

কথার মাঝখানে ঘণ্টা পড়ে। অভী বুড়োকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে বলে, খুব ছোটবেলায় দেখেছিলাম। যদি ভুল করে ফেলি। আপনি যদি কষ্ট করে—

খুশির গলায় বুড়ো বলে, কষ্ট কিসের! বাইরে আসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি মিসেস চ্যাটার্জিকে।

এই বুড়োকে সামলাতে অসুবিধে হবে না অভী জানত। ওর লম্বা-চওড়া চেহারা, ভারি মুখ সহজেই মানুষের সমীহ আদায় করে নেয়। আজ আবার পরেছে ধূসর রঙের দামী প্যান্ট, মাখন রঙের সার্ট। ঘামে ভেজা সার্ট ফুঁড়ে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। চোরা চোখে হলেও মেয়েরা ওর দিকে তাকাবেই।

লোকটির পিছু পিছু বারান্দায় বেরিয়ে এলো অভী। লম্বা টানা বারান্দা। মেয়েদের গলায় কল কল শব্দ শোনা যাচ্ছে। চারজন মহিলা বয়সই যাঁদের শিক্ষিকা বলে চিনিয়ে দেয়—নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছেন। অভী কৌতূহলী চোখে অনুমানের চেষ্টা করে, কোনজন মালবিকা। আর হঠাৎই ওর বুকের মধ্যে ড্রাম বাজতে থাকে। কপালে ঘাম জমে।

মহিলা চারজন ওর দিকে তাকিয়ে টিচার্স রুমে ঢুকে গেলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে অভী বুড়ো লোকটিকে খুঁজল। নেই। গেল কোথায় লোকটা? খুব অস্বস্তি বোধ করে। ক্লাস থেকে মেয়েদের উঁকিঝুঁকি চোখে পড়ায় আরো ঘেমে ওঠে। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে অভী শালিকের ছোটাছুটি দেখে। নাকের সামনে দিয়ে ফস করে একটা প্রজাপতি উড়ে যায়।

একটু পরেই কলধ্বনি থেমে স্তব্ধতা ফিরে আসে। সবাই আবার যে যার ক্লাসে। কয়েক পা এগিয়ে অভী টিচার্স রুমে উঁকি দেয়। ফাঁকা। কেউ নেই। ও অফিসের দিকে যাবার কথা ভাবে।

ঠিক তখনি ডান দিকের বারান্দা থেকে বুড়ো লোকটি বেরিয়ে আসে। তার

পেছনের মহিলাকে দেখেই হৃদপিণ্ড গলায় আটকে যায় অভীর। ছোটমাসীর মতন মুখ। রংটা ছোটমাসীর তুলনায় ফর্সা। শরীরও ভারি। ঠিক মোটা নয়, তবে মেদ আছে।

—এই যে মিসেস চ্যাটার্জি—লোকটি আরো কি বলে অভী শুনতে পায় না। নিবিষ্ট চোখে ও তাঁকে দেখে। মা! যাঁর গর্ভে ও ছিল। যাঁর স্তন্যপান করেছে। যাঁর রক্ত বইছে ওর শরীরে। এই মহিলাই মা তবে! গতকাল ছোটমাসীকে দেখে যা মনে হয়েছিল, এঁকে দেখেও একই কথা মনে হলো। শাড়িটা আরেকটু দামী ও পরিচ্ছন্ন হলে, মুখে সচ্ছলতার লাবণ্য থাকলে এঁকেও ঠিক দীপকের মার মতনই দেখাত। মায়েদের বোধহয় আলাদা একটা রূপ আছে সে-রূপ সকল মায়েরই একই রকম।

মালবিকা অবাক চোখে সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবকটিকে দেখছিলেন। সার্ট-প্যান্টের অভিজাত্যও তাঁর নজর এড়ায়নি। এ-যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো কেন? তিনি তো ওকে চেনেন না। কখনো দেখেছেন বলেও মনে পড়ে না। অথচ নিজের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তির বেড়ে ওঠা টের পান।

প্রণাম করার জন্য ঝুঁকতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলায় অভী। বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না হাত জোড় করে বলে, নমস্কার। আপনার আমাকে চিনতে পারার কথা নয়! আমার নাম অভী রায়চৌধুরী ছোটবেলায় সবাই টুটুন বলে ডাকত। দু'মিনিট কথা বলতে পারি?

অভী স্পষ্ট দেখেছিল মালবিকার চোখের তারার বিস্মিত উল্লাসে জলে ওঠা। মুহূর্তের জন্যই গলার কাছে ফুলে উঠেছিল আবেগের ঢেউ। ছুঁচলো ঠোঁটে ককিয়ে উঠেছিল—টু—। ব্যস, ঐটুকুই। এক পলকের বিভ্রম। পরক্ষণেই শান্ত গলায় মালবিকা বললেন, আমরা টিচার্স রুমে কথা বলতে পারি। এ-পীরিয়ড আমার অফ।

মালবিকার পেছনে হেঁটে টিচার্স রুমে ঢুকলো অভী। ঘরের ডানদিকের একটা চেয়ারে বসে মালবিকা আঁচলে মুখ মুছলেন। এদিকটা বারান্দার চোখের আড়ালে। আরেকটা চেয়ার টেনে তাঁর মুখোমুখি বসে অভী। নিজের মধ্যে অভী নানা বিরুদ্ধ অনুভূতির তোলপাড় টের পায়। আবেগের গোঁ ধরে এতদূর ছুটে এসে এখন ভীষণ বিমূঢ় লাগছে।

অভী বললো, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

উত্তর দিলেন না মালবিকা। স্তব্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মুখে কোনো রেখা ফোটে না।

অভী আবার বলে, আমার বাবা—হিমাদ্রি রায়চৌধুরি। জলপাইগুড়িতে আমাদের বাড়ি ছিল। মনে আছে আপনার?

এবারও উত্তর দিলেন না মালবিকা। পরিচয়ের কোনো চিহ্নও ফুটে উঠল না তাঁর চোখে বা মুখে। দৃষ্টি স্থির। অপলক। ভাষাহীন।

ভীষণ অসহায় বোধ করে অভী। সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়। অসম্ভব খালি লাগে বুক। পাঁজরে ঠাণ্ডা অনুভূতি। ওর চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এটা গার্লস স্কুল। নিজের কাছেই অনুজ্ঞা নিয়েছে, এঁকে বিব্রত করবে না।

মরীয়া হয়ে অভী বললো, আপনি কিছু বলছেন না! আমার মা আপনি। শুধু আপনাকে দেখার জন্যই আমি নিউইয়র্ক থেকে ছুটে এসেছি। তবু কিছু বলবেন না?

নিশ্চুপ নিশ্চল বসে থাকেন মালবিকা। অভী কী বলছে যেন শুনছেন না। বা ওর ভাষা যেন বোঝেন না। কোনো শব্দের মানেই তাঁর কাছে বোধ্য নয়। তিনি শুধু অপলক ওকে দেখেন। সুন্দর সুঠাম যুবক। গলার স্বরে মাদক পৌরুষ। কোন গ্রহের মানুষ ও?

অসহায় বিমূঢ় অভীর হঠাৎ সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করে। বুঝতে পারে নিজের ভেতরে রাগ জমে উঠছে। রুক্ষস্বরে বললো, সিগারেট ধরাতে পারি?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানান মালবিকা।

সিগারেটে ঘন-ঘন টান দিয়ে ভেতরের উষ্ণতাকে শাসনে রাখার চেষ্টা করে অভী। তারপর গাঢ় চোখে মার দিকে তাকায়। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে সিঁদুরের টিপ। হাতে দুটো চুড়ির সঙ্গে শাঁখা। শাদা খোলের তাঁতের শাড়ি। পাড়টা সবুজ। সবুজ ব্লাউজ। মুখে সময়ের ইতস্তত আঁচড়। চোখ উদাস। অভীর ইচ্ছে করে হাঁটু গেড়ে কোলে মুখ রেখে মাকে জড়িয়ে ধরে। মায়ের হাত উঠে আসুক ওর মাথায়। বিলি কাটুক চুলে। অন্তত একবার। জীবনে একবার মায়ের স্পর্শ শরীরে বয়ে নিয়ে যাবে ও। একবার টুটুন ডাক শুনবে। একবার ও মা বলে ডাকবে। একবার—শুধু একবার।

ছবির মতন বসে থাকেন মালবিকা। সেছবি ম্যাডোনার নয়। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলেরও নয়। একজন মধ্যবয়সী নারীর। নির্বাক। অভিব্যক্তিহীন।

জুতোর তলায় সিগারেট পিষে অভী বললো, দেখুন আপনার কোনো ভয় নেই। আমি কিছু চাইতে আসিনি। আপনার কোনো ক্ষতি করতেও আসিনি। আমি শুধুই আপনাকে দেখতে এসেছি। কারণ—

মালবিকার চোখের ওপর সন্ধানী দৃষ্টি রেখে ইচ্ছে করে থেমে গেল অভী। কারণ জানার জন্য তাঁর চোখে কৌতূহল ছলকে ওঠে কিনা দেখবে। বা ঠোঁটে শব্দ। কয়েক মুহূর্তের উদগ্রীব অপেক্ষা। প্রত্যাশা পূরণ হলো না। মহিলার চোখ মুখ একই রকম ভাষাহীন।

কী করবে ভেবে পায় না অভী। এখানে স্কুলে বসে 'সীন' করার তো মানে নেই। ক্ষুব্ধ ভাবে উঠে দাঁড়ায় ও। পকেট থেকে কার্ড বের করে, হোটেলের নাম করে বললো, এই হোটেলে আছি। ৮০৪ নম্বর ঘর। আর এই আমার কার্ড। এতে নিউইয়র্কের ঠিকানা আছে। আমি নিশ্চিত আপনারই ছেলে। আপনি আমার মা। যদি কখনো মনে করতে চান, স্বীকার করতে চান, জানাবেন।

একটু থেমে আবার বললো, সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ। এখন চলি।

অভী ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মালবিকাও দাঁড়িয়ে পড়েন। অভী আরেকবার তাঁর দিকে তাকিয়ে ঘরের বাইরে পা রাখতে উদ্যত হয়। সেই মুহূর্তে ধীর গলায় মালবিকা বললেন, আমার মনে হয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য অভী বোধবুদ্ধিহীন হয়ে যায়। একটি উচ্চারণেই ও দেউলিয়া হয়ে গেল। মুখে আর কোনো শব্দ জোগায় না। বেলুনের বায়ু নিঃশেষ। মাথা নিচু করে ধীর পায়ে অভী বেরিয়ে আসে। স্কুলের গেট পেরুবার আগে একবার পিছে ফিরে স্কুলের বদলে নিজের ছায়া দেখেছিল। লজ্জায় অপমানে সেই ছায়া নিজেকে গুটিয়ে শরীরে সেঁধিয়ে যায়। কিন্তু ও কোথায় যাবে? কোথায় মুখ লুকোবে?

বীয়ারের বোতলে শেষ চুমুক দিয়ে বোতলটা ছুঁড়ে মারতে গিয়েও অভী থেমে যায়। হোটেলের দেয়ালে কাঁচ ভেঙে কি লাভ! নিজেরই পা কাটবে হয়ত। বোতলটা টাবের পাশে নামিয়ে রাখে। তখনই মাথায় প্রশ্নটা জাগে।

বাপের পরিচয় বা স্বীকৃতি না থাকলে ছেলে হয় জারজ। মাতৃপরিচয় না থাকলে তাকে কি বলে? বেজন্মা? তা কেন, ওর তো পিতৃপরিচয় আছে। তা হলেও কি বেজন্মা বলবে? না, বোধহয়। সম্ভবত মাতৃপরিচয়হীন সন্তানের জন্য কোনো শব্দ নেই পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই।

বাথরুম কাঁপিয়ে হা-হা শব্দে হেসে ওঠে অভী। টাব ছেড়ে গা মুছতে মুছতে বলে, শালা! আমার জন্য নতুন শব্দ বানাতে হবে।

ঘরে ফিরে আবার ফ্রিজ খোলে অভী। বীয়ার আর নেই। রুম-সার্ভিসে ফোন করলেই এনে দেবে। অত দেরি সয় না। নিজের আনা এক লিটারের হুইস্কির বোতল খুলে বসল।

কতক্ষণ ধরে কতটা হুইস্কি খেয়েছে মনে নেই। অচেতন হয়ে শুয়ে পড়ার আগে একবার চোখে সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠেছিল: নিজের পুরুষাঙ্গ হোস পাইপের মতন ধরে তাবৎ নারীর মুখ পেচ্ছাপে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

মুখে উচ্চারণ ছিল: এভরি উওম্যান ইজ আ ডার্টি বিচ্।

টেলিফোনের কর্কশ শব্দে চোখ খোলে অভী। ঘরে আবছা অন্ধকার। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। টেলিফোন বাজতেই থাকে। অভী বিরক্ত। চোখ কচলে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তোলে।—হ্যালো।—নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই অচেনা লাগে—ভারি ও ভাঙা।

—গুড মর্নিং স্যার। রিসেপশন থেকে বলছি। আপনার একজন ভিজিটর আছে।

—বিরক্ত করবেন না আমাকে। আমি কারুর সঙ্গে দেখা করব না।—বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখে অভী।

বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে ফিরে আসে। বুকভরা পিপাসা। আধবোতল ঠাণ্ডা জল গলায় ঢালে। জলের স্বাদ মিষ্টি। বোতল রেখে, আবার তুলে নেয়। এবার গ্লাসে ঢেলে ধীরে ধীরে চুমুক দেয়। এখন ঠাণ্ডা জলের স্বাদ হুইস্কির চেয়েও ঢের বেশি প্রিয় লাগে। জল খেয়ে মাথার যন্ত্রণার জন্য এ্যাসপিরিন খাবে কিনা ভাবে অভী।

আবার টেলিফোন বাজে।

বিরক্ত হাতে রিসিভার তুলে অভী বলে, বলেছি না আমাকে উত্যক্ত করবেন না—

কথার মাঝখানেই শোনে, স্যার, ক্ষমা করবেন। একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি—

—আমি কোনো মহিলাকে চিনি না।

—ইনি বলছেন নাম বললেই চিনবেন-মালবিকা চ্যাটার্জি।

—কে মালবিকা চ্যাটার্জি? আমি চিনি না। ঘোরের মধ্যে কথাগুলো মুখ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হয় অভীর, গতকালের সব কথা মনে পড়ে। তক্ষুণি বলে, হ্যালো-হ্যালো -

—বলুন স্যার।

উনি-মালবিকা চ্যাটার্জি—নিজে এসেছেন?

—হ্যাঁ, স্যার।

—ওঁকে একটু বসতে বলুন। আমি এখনই আসছি।

এই সাত সকালে হোটেলে এসেছেন তিনি! কাল তিনি একটাও কথা বললেন না, বরং বললেন ও ভুল করছে! অভীর আশ্চর্য লাগে।

পর্দা সরিয়ে নিতেই উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে যায়। অভী ঘড়ি দেখে। ৯টা। ওঃ, এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, ও ভাবছিল বুঝি ভোর।

টেবিলের ওপর থেকে হুইস্কির বোতল গ্লাস সরিয়ে বাথরুমে ঢোকে অভী। দশ মিনিটের মধ্যে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে বেরিয়ে আসে। পাটভাঙা সার্ট-প্যান্ট পরে ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটের বোতাম টেপে।

মাথায় চিন্তাটা পাক দেয়। এত সকালে স্কুলে না গিয়ে নিজে এসেছেন কেন? খবর দিলে ও নিজেই যেতো। ওঁর আসায় অভীর খুশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ও খুশি হতে পারছে না। কেন? কেবল একটা তীক্ষ্ণ কৌতূহল মুখিয়ে উঠছে।

লিফটে নামতে নামতে নানা সম্ভাবনা মাথায় কাটাকুটি খেলে। অথচ অভী নিজের মধ্যে আনন্দের বা উল্লাসের ঢেউ ভাঙা টের পায় না। ড্রাম-বিউগলের শব্দ নেই বুকে। কাল ছিল।

লিফট থেকে বেরিয়ে সন্ধানী চোখে তাকাতেই লাউঞ্জের চেয়ারে তাঁকে দেখতে পেল অভী। কমলা রং পাড়ের শাদা শাড়ি। আজ ব্লাউজও শাদা। কপালে ভাঁজ। টেনস হয়ে আছেন যেন। অভী ভাবলো, আচমকা ওর উপস্থিতি মানসিক চাপ সৃষ্টি করতেই পারে।

সামনে দাঁড়িয়ে অভী বললো, নমস্কার। এই সকালে আপনি নিজে এতদূর কেন এলেন!

ওর মুখের ওপর চোখ রেখে মালবিকা বললেন, খুব অসুবিধেয় ফেললাম বোধহয়।

ব্যস্ত ভাবে অভী বলে, না, না। কোনো অসুবিধে নেই। আসলে আমি

ভাবতেই পারিনি আপনি—

—একটু কথা বলতে চাই। সুবিধে হবে?

—আপনার আপত্তি না থাকলে আমার ঘরে আসতে পারেন।

—সেই ভালো বলে মালবিকা উঠে দাঁড়ান।

অভীর তাঁকে ক্লান্ত মনে হয়। এবং বিপদগ্রস্ত। কালকের ঋজু নির্বিকার ভাব নেই আজ। লিফটে যেতে যেতে লক্ষ্য করে ওঁর চোখে ঈষৎ রক্তাভা চোখের কোলে কালি যেন টিপছাপ দিয়েছে কেউ।

—ঘরে ঢুকে ওঁকে চেয়ারে বসতে বলে রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করে, চা খাবেন?

—না, না। কিছু লাগবেনা। এক গ্লাস জল শুধু।

—চা বলে দিই। আমিও সকাল থেকে খাইনি।

রুম-সার্ভিসে চায়ের জন্য বলে গ্লাস ধুয়ে ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে দেয়। তাঁর সামনে ফ্রিজ খুলে বোতল বের করতে ইচ্ছে করল না।

মালবিকা এক ঢোঁকে আধগ্লাস জল খেয়ে হাতে গ্লাসের হিম-স্বাদ নিতে-নিতে ঘরটা দেখেন

বললেন, এত বড় হোটেলে কখনো আসিনি। ঘরটা খুব সুন্দর। হোটেলের ঘরে ফ্রিজও থাকে জানতাম না। কত চার্জ?

অভী মৃদু হাসে, চারশ' টাকা পার ডে।

—আমাদের সারা মাসের বাড়ি ভাড়া আড়াইশো টাকা। তাও বাকি পড়ে। থাকগে, এসব বলার জন্য আসিনি কিন্তু।

পাশের টেবিলে গ্লাস রেখে আঁচলে হাত মুছলে মালবিকা। চোখ তুলে কোনাকুনি বসা অভীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল আমার ব্যবহারে খুব অবাক হয়েছ নিশ্চয়।

অভী বললো, হ্যাঁ—মানে—আপনি কিছুই বললেন না—শেষে আবার ভুলের কথা—আমি রিয়েলি পাজলড!

মালবিকা বললেন, ভাবতেই পারিনি—কল্পনাও করিনি কখনো, এত বছর বাদে আমাকে কেই খোঁজ করবে। তুমি এত বড় হয়েছে, সুন্দর হয়েছ দেখে খুব ভালো লাগছিল। কিন্তু—ঢোঁক গিললেন মালাবিকা। মাথা নিচু করে ভাবলেন কিছু। বললেন, তোমাকে টুটুন ডাকা আমাকে সাজে না বোধহয়, অভী-ই বলছি। অভী, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

—সে কি!—হতভম্ব অভী। গতকাল সেইতো ভিক্ষার্থী হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কী চাওয়ার থাকতে পারে। মাথার যন্ত্রণাটা বেড়ে ওঠে অভীর।

এই সময় দরজায় শব্দ হয়। দরজা খুলে অভী বেয়ারাকে চা-ট্রে রাখতে দেয়। বেয়ারা চলে গেলে নিজেই চা ঢেলে মালবিকার দিকে কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে, চিনি এক চামচ দিয়েছি।

মালবিকা নিঃশব্দে কাপ হাতে নেন।

ড্রয়ার থেকে অ্যাসপিরিন বের করে, মুখে পুরে, র চায়ে চুমুক দেয় অভী।

দু'তিন চুমুক দিয়ে আধভর্তি কাপ রেখে দেন মালবিকা। অভী খালি কাপ আবার ভরে নেয়।

—অভী, মালবিকা বলেন, তুমি আমাকে যা-ইচ্ছে বলো, আমার সম্পর্কে যা-খুশি ভাবো, কিন্তু আমার অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। বলো, রাখবে?

অভী চুপচাপ তাঁকে দেখে। কিছুই ভাবতে পারে না।

মালবিকা বললেন, তোমার উপর কোনো জোর নেই আমার। সেজন্য ভিক্ষা চাইছি, অভী, ভিক্ষা।

নিজের ভেতরে ককিয়ে ওঠে অভী। এই মহিলাকে ও সর্বস্ব—ছেলে তার মাকে যা কিছু দিতে পারে—দিতে প্রস্তুত। শুধু একটা টুটুন ডাক, কপালে একবার স্নেহের হাত, ও চিরকাল মাতৃদাস হয়ে থাকবে। অথচ ইনি কেবল ভিক্ষা চাইছেন। কী ভিক্ষা? এদেশের মানুষের বড্ড বেশি ভিখারী-স্বভাব!

সরল গলায় অভী বললো, কী চান আপনি?

মালবিকা ওর চোখে চোখ স্থির রেখে শান্ত দৃঢ় গলায়, যে-ভাবে ক্লাসে নোট লেখান, বললেন, তুমি আর কোনোদিন—কক্ষনো—আমার খোঁজ করবে না। মনে করো আমি মরে গেছি। সত্যিইতো তোমার জীবনে আমি বেঁচে নেই!

নানা সম্ভাবনার কথা ভেবেছিল অভী। এটা ভাবেনি। ভাবতে পারেনি। ওর এত বছরের শিক্ষা-দীক্ষা অভিজ্ঞতা (কর্ণকুন্তীসংবাদ ও বহুবার পড়েছে) তছনছ হয়ে যায়। ওর মনে হয় এক অতল খাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে সরার জায়গা নেই। পায়ের তলার মাটি ধ্বস হয়ে নামছে। গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে—তার মানে?

—অভী, আমি জানি তুমি কি ভাবছ। আমি খারাপ—খুবই খারাপ। কিন্তু এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। শুধু ভেবেছি কি বলবো তোমাকে। তুমি বিশ্বাস করবে না, কেউ বিশ্বাস করবে

না, তবু বলছি, তোমাকে বাড়িতে নিয়ে সবাইকে ডেকে দেখাতে পারলে কী দারুণ খুশি হতাম। কিন্তু আমি নিরুপায়, অভী।

—কেন ?

—অভী, বাইশ বছর ধরে অনেক কষ্ট করে আমি একটা সংসার গড়ে তুলেছি। আমার ছেলেমেয়ে আছে, তারা বড় হয়েছে। সামনেই মেয়ের বিয়ে। এরা কেউ জানে না তোমার কথা। আমি ওদের বলতেও পারব না।

—মিঃ চ্যাটার্জি তো জানেন।

—নিশ্চয় জানে। ওর জানার কিছু এসে যায় না। অন্যরা তো মেনে নেবে না। জানাজানি হলে সারাজীবন ধরে যা গড়ে তুলেছি সব চুরমার হয়ে যাবে। হয়ত মেয়ের বিয়েও হবে না তুমি আমাকে দয়া করো, অভী।

অভী আর পারে না। হা-হা শব্দে হেসে ওঠে। বুক-চেরা হাসি। চোখে জল জমে। রুমালে চোখ মুছে বলে, আপনি আমার মা, আমি আপনার ছেলে —এটাও অন্যদের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে ?

মাথা নাড়েন মালবিকা—করে, অভী।

জেদ চাপে অভীর। রাগে শরীর গরম হয়ে ওঠে। চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলে, আপনার অনুরোধ যদি না—রাখি, যদি কালই স্কুলে গিয়ে আপনাকে মা বলে ডাকি সকলের সামনে—

কঠিন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় মালবিকা বললেন, আমি অস্বীকার করব।

অবিশ্বাসের স্বরে অভী বলে, আমি আপনার পেটের ছেলে—এটাও অস্বীকার করবেন ?

—আমার উপায় নেই, অভী।

—গেট আউট—গেট আউট য়ু ব্লাডি বিচ্।—গলার মধ্যে শব্দগুলো বেরিয়ে আসার জন্য তোলপাড় করলেও প্রাণপণ চেষ্টায় গিলে ফেলতে পারল অভী। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে প্যাকেট তুলে সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে জ্যোৎস্নায় মতন রোদ্দুর। আকাশ ঈষৎ ঘোলাটে। বাস-মিনি বাসে ঝুলন্ত মানুষ। জীবন চলছে ঠিকঠাক। অভী চোখ বুজে সিগারেট টানে। রজতদার কথা মনে পড়ে। অ্যাঞ্জেলার কথাও। ঠিক বলেছিল, ও সত্যিই ক্রেজী ফুল !

ঘুরে দাঁড়িয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে কয়েক পা এগিয়ে এসে অভী

বললো, আপনার নিশ্চয় আর কিছু বলার নেই।

মালবিকা মাথা নাড়েন।

—চলুন তবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের গেট পর্যন্ত আসার পথে দুজনে কেউই কথা বলে না। অভীর কিছু বলার নেই আর। ও আজই যে-কোনো ফ্লাইটে যে-কোনো রুট ধরে নিউইয়র্ক ফিরে যাবার চেষ্টা করবে। বাবার সঙ্গে এবারে আর দেখা করার মন-মেজাজ নেই। অসহায় নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ মানুষটিকে মিথ্যে বলতে পারবে না ; সত্য বলেও কষ্ট দিতে পারবে না।

গেটের বাইরে এসে অভী বললো, এখন কি স্কুলে যাবেন ?

মালবিকা বললেন, হ্যাঁ। তুমি যাও, আমি বাস ধরে ঠিক চলে যাবো।

অভী বললো, চলি তবে। আমার সাধ ছিল আপনাকে দেখার। দেখা হলো। ধন্যবাদ।

মালবিকা আর্তস্বরে ডাকেন, অভী—

অভী বলে, ভয় নেই। মায়ের বয়েসী মহিলাদের ধাওয়া করা আমার স্বভাব নয়।

প্রবন্ধ

বাংলা কারক-বিভক্তি

পবিত্র সরকার

বাংলা স্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণে কারক-বিভক্তি বিষয়টি খুব গোলমেলে অবস্থায় আছে। বাংলা ভাষায় ক-টি কারক এবং তার কী-কী বিভক্তি—এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রায় কোনো বইয়েই নেই, ফলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে ব্যাকরণের আরো অনেক অংশের মতো এটাও একটা দুঃস্বপ্নের এলাকা। অধিকাংশ শিক্ষকের ব্যাকরণে রুচি নেই বলে অনিচ্ছাসহকারে বিষয়টি পড়ান এবং সেই নিরানন্দ ঘটনায় ছাত্রছাত্রীরা সাগ্রহে যোগদান কেন করবে সেই সংগত প্রশ্নটা উঠেই পড়ে। তার উপর পড়ানোর বিষয়টাই যদি অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল থাকে তাহলে তো কথাই নেই। এই বিশৃঙ্খলা কাটানোর চেষ্টা যে এতদিন হয়নি, সেও খুব আশ্চর্যের।

বিভ্রান্তির উৎস একাধিক। প্রথম উৎস সংস্কৃত কারক-বিভক্তি প্রকরণের মৌলিক গণ্ডগোল, যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রবন্ধে (১৩০৮) খুব সুন্দর করে বোঝানো আছে—"কারক অর্থ-সাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দ-সাপেক্ষ! সংস্কৃতে অনেকগুলি বিভক্তি আছে, অনেকগুলি কারক আছে, কারক ভিন্ন নানা সম্বন্ধে নানা কারণে নানা বিভক্তির উৎপত্তি হয়।" এ কথার তিনটি ইঙ্গিত—১। কারক থাকলেই বিভক্তি থাকবে এমন নাও হতে পারে। ২। বিভক্তি থাকলেই তা কারকের বিভক্তি হবে তার কোনো অর্থ নেই। আর, ৩। একই কারকের যে একই বা এক ধরনের বিভক্তি হবে তাও বলা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটির পৃথক আলোচনার আগে কারক প্রসঙ্গে মূল কথাগুলি বলে নেওয়া ভালো।

সংস্কৃত মতে কারক হল 'ক্রিয়ান্বয়ী'—অর্থাৎ বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে যে-শব্দের কোনো সম্বন্ধ আছে তারই একটি 'কারক' আছে। এ সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে অর্থের দিক থেকে। কেউ ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে, তাকে প্রকাশ করছে যে শব্দ—তার কর্তৃকারক; যে-ব্যক্তি বা বস্তু বা বস্তু ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, তার প্রকাশক শব্দটি পাচ্ছে কর্মকারক; ক্রিয়া সম্পাদনে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সহায়তা নেওয়া হচ্ছে, তাদের অর্থবোধক শব্দটি আসছে করণকারকে, কারো উদ্দেশ্যে বা নিমিত্ত কাজটি ঘটছে—প্রকাশক শব্দটি সেখানে সম্প্রদান; কোনো উৎস থেকে ক্রিয়াটির উদ্ভব, বা ভিন্নতা ঘটছে, তার শব্দ অপাদান কারক; যে স্থান বা কাল ইত্যাদির পটভূমিকায় কাজটি ঘটছে, তার বাচক শব্দটি যাচ্ছে অধিকরণকারকে।

এ ছাড়া আছে দুটি 'পদ',—সম্বন্ধ আর সম্বোধন। সংস্কৃতমতে পদ কারক নয়, কারণ পদের বেলায় ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ ঘটছে না, সম্বন্ধ ঘটছে বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনামের। 'আমার বই'—এতে সর্বনাম 'আমি' আর বিশেষ্য 'বই' যুক্ত হচ্ছে—এখানে ক্রিয়ার কোনো প্রসঙ্গই নেই। ফলে এগুলি পদ, কারক নয়। ইয়োরোপীয় মতে সবই 'কেস' (Case), কারণ সেখানে 'কেস' মূলত শব্দের প্রকট রূপ নির্ভর—তা বাক্যে ব্যবহৃত "নাউনের কন্‌ডিশান" সূচক। অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত হতে গেলে বিশেষ্য বা সর্বনাম যে অন্য রকম একটু চেহারা নেয়—সেই চেহারার চিহ্ন হল কেস। কার্ম (Curme)-এর একটি প্রচলিত ইংরেজি ব্যাকরণে কেস-এর সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে "এ কেস ইজ দ্যাট ফর্ম অর প্যোজিশন অব এ নাউন অর এ প্রোনাউন হুইচ মার্কস ইট অ্যাজ দ সাবজেক্ট অর দি অবজেক্ট অব এ ভার্ব, অ্যাড-জেক্টিভ, অর প্রিপজিশন, অর অ্যাজ প্লেয়িং পার্ট অব অ্যান অ্যাডজেকটিভ আর অ্যাডভার্ব।" এতে প্রথমত ক্রিয়া, বিশেষণ বা প্রিপজিশনের কর্তা বা কর্ম হিসেবে বিশেষ্য ও সর্বনামের 'রূপ' ও শব্দে অবস্থানকে কেস বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণের অংশ হিসেবেও বিশেষ্য/সর্বনামের 'রূপ' বা 'অবস্থান'কে ঐ 'কেস' ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ সংস্কৃত কারক মূলত ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধে বাক্যের অর্থের মধ্যে প্রকাশিত, আর ইয়োরোপায় 'কেস' বাক্যে বিশেষ্য ও সর্বনাম যে নানা ভূমিকা নিচ্ছে তার 'রূপ ও অবস্থান'-এর মধ্যে প্রকাশিত। একটি অর্থগত ধারণা, আর একটি অর্থ ও রূপগত ধারণা। তবে সংস্কৃতেও কারকের চিহ্ন যেমন বিভক্তি (সংখ্যাকারক-বোধয়িত্রী বিভক্তিঃ),

ইয়োরোপীয় কেস-এর চিহ্নও তাই, যার ইংরেজি নাম ending বা suffix।

আমরা জানি, সংস্কৃত কারকে শুধু কারকেরই বিভক্তি নেই, লিঙ্গের বিভক্তি আছে, বচনের বিভক্তি আছে। আর কারকেরও যে বিভক্তি আছে, তার বিন্যাস এরকম নয় যে, বিভক্তি দেখলেই তা কোন্ কারক বলে দেওয়া যাবে, কিংবা কারক ধরতে পারলে তার কী কী বিভক্তি হবে তা সব ক্ষেত্রে নির্ভুল বলা সম্ভব হবে। অর্থাৎ যে-কোনো ব্যবহৃত ভাষার মতোই সংস্কৃতে কারক আর বিভক্তির মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বা 'ওয়ান-টু-ওয়ান কোরেসপনডেন্স' (one-to-one Correspondence) নেই। সেখানে এক কারকের একাধিক বিভক্তি হতে পারত। যেমন কর্তায় প্রথমা, ষষ্ঠী ('কৃত্যাণাং কর্তরি বা' কিংবা 'বিভাষা ভাবে' সূত্রে); কর্মে দ্বিতীয়া, চতুর্থী ('মন্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষা' বা 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' ইত্যাদি সূত্রে), পঞ্চমী ('ল্যলোপে কর্মন্যধিকরণে চ'), ষষ্ঠী ('উভয় প্রাপ্তৌ কর্মণি', 'বা স্মরণার্থদয়েশাং কর্মণি ষষ্ঠী'); করণে তৃতীয়া, ষষ্ঠী ('তৃপ্ত্যর্থানাং বিভাষা করণে') ইত্যাদি। আবার, অন্যরূপভাবে, একটা বিভক্তি একাধিক কারকের অর্থ প্রকাশ করত। যেমন প্রথমা বিভক্তিতে কর্তা, কর্ম ('উক্ত-কর্মণি') ও ('বিভাষা দিবঃ করণম্'), অধিকরণ ('অধ্বনে ব্যবধৌ'); দ্বিতীয়াতে কর্ম, করণ, অধিকরণ ('অধি-শী-স্থাকাম্ অধিকরণম্', 'উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ', 'অভিনিবেশো বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে), সম্প্রদান (ক্রুধদ্রুহোরুপসৃষ্টয়োঃ সম্প্রদানম্'); তৃতীয়া বিভক্তিতে করণকারক ছাড়াও অধিকরণ ('হেত্বর্থে'), সম্বন্ধ পদ ('তুল্যার্থৈঃ'); চতুর্থীতে কর্ম (মন্য কর্মণ্যনাদরে', 'গত্যর্থকর্মণি চেষ্টায়াম্') ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত প্রাগ্ শহরের ভাষাতাত্ত্বিকদের পরিভাষার সাহায্য নিয়ে বলা যেতে পারে যে, একটা কারকে একটা বিশেষ বিভক্তিই unmarked (প্রধান, স্বাভাবিক বা প্রতিনিধিস্থানীয়) ছিল। বাকি সব marked বা ব্যতিক্রম। সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয়েছে, 'বিবক্ষা', অর্থাৎ বলার ঝোঁকে এরকম কিছু-কিছু ব্যতিক্রম হতেই পারে। সেইজন্যই নানা সূত্র খাড়া করে ছাত্রছাত্রীদের সেগুলি আলাদা করে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হত।

বাংলা যদি চিনা ভাষার মতো প্রায় বিভক্তিহীন ভাষা হত, তাহলে অর্থের দিক থেকে কারক ভাগ করার কোনো অসুবিধেই হত না। যত রকমের শব্দসম্বন্ধীয় অর্থ আছে ততরকমের কারক মনের সুখে ভেবে নিয়ে একটা-একটা গালভরা নাম দিলেই হত। ইদানিংকার ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস জে ফিলমোর

যেমন দিয়েছেন। কিন্তু অর্থ দিয়ে কারক চিনতে হলে তার সঙ্গে কোনো প্রকাশ্য চিহ্ন যদি না পাই—ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব বা 'মরফোলজি' অংশে তার আলোচনা করা মুশকিল। আর অর্থেরও কোনো শেষ নেই। 'সে বাড়ি আছে'—তে 'বাড়ি' এক কারক হতে পারে, কারণ 'বাড়ি' ক্রিয়ার আধার, কিন্তু 'সে বাড়ি যাচ্ছে'-তে 'বাড়ি' অন্য কারক হতে পারে, কারণ সেটি ক্রিয়ার 'লক্ষ্য'। অর্থ-অনুযায়ী কারক-পরিকল্পনা করতে গেলে হয়তো ডজন-ডজন 'কারক' তৈরি হবে।

কাজেই একটা চিহ্ন থাকা দরকার অর্থের সঙ্গে, না হলে সে কারক ব্যাকরণের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক হবে না। নব্য-কারকতত্ত্বে এইখানেই সংকট দেখা গেছে—এই অর্থের কারক ও ব্যাকরণের কারককে মেলাবার চেষ্টাতে। ১৯৬৮ সাল নাগাদ মূলত মার্কিনদেশে চম্স্কি-পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে 'কেস্' নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ হয়েছিল। এই আলোচনার সূত্রপাত করেন চার্লস জে ফিলমোর। 'দ কেস্ ফর কেস্' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি ঐ নব্য-কারককে মূলত অর্থের দিক থেকেই বিন্যাস করেন। এবং দাবি করেন যে এই কারকগুলি মানুষের সমস্ত ভাষাতেই আছে, অর্থাৎ এগুলি আজকের ভাষায় 'ইয়ুনিভার্সাল'। তিনি এরকম ছ-টি কেস্-এর প্রস্তাব করেন। প্রথম হল 'এজেক্টিভ্' (A); তা দেখা যায় ক্রিয়ার সজীব (animate) কর্তার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত ইন্স্ট্রুমেন্টাল (I)—ক্রিয়াটি যে 'অজীব' শক্তি বা বস্তুর সহায়তায় নিষ্পন্ন হয়। তৃতীয়ত 'ডেটিভ' (D)—ক্রিয়ায় ফলে যে সজীব সত্তা প্রভাবিত হয়। চতুর্থত ফ্যাক্টিটিভ (F), ক্রিয়ার ফলে যে বস্তু বা সত্তার উদ্ভব বা উৎপত্তি হয়। পঞ্চমত 'লকেটিভ' (L)—ক্রিয়ার স্থানিক আশ্রয় বা আধার যাতে প্রকাশিত; এবং ষষ্ঠত অব্জেকটিভ (O)—ক্রিয়াতে বর্ণিত ঘটনা বা অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত বিশেষ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এই ছটি কারকের ধারণার সঙ্গে শব্দরূপের সম্পর্ক কী হতে পারে তা ফিল্মোর আলোচনা করেছেন। পরে ১৯৭১-এ আরেকটি নিবন্ধে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর আগেকার কারক-প্রকল্প বেশ কিছু অসুবিধে দেখা দিচ্ছে। তিনি ওহায়ো রাজ্য থেকে তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে চাকরি নিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়াতে জাদুবিদ্যা-তন্ত্রমন্ত্র-ডাকিনীবিদ্যার চর্চা আছে—এর সঙ্গে যুক্ত কিছু লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপও হয়েছে। ফিলমোর বলছেন, কারক বিষয়ে গবেষণা শেষ করার জন্য তিনি এঁদের সাহায্য নেবার কথা ভাবছেন। ফিল্মোর এসব কথা রসিকতা

করে বললেও এর মধ্যে 'কেস্-গ্রামার' সম্বন্ধে একাধিক ভাষাবিজ্ঞানী বেশ বড়ো-সড়ো বই লিখে ফেলেছেন। এঁদের মধ্যে ওয়ালেস এল চেফ্ (Chafe) এবং জন এম অ্যান্ডারসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই নব্য কারকতত্ত্ব এই মুহূর্তে বাংলা কারক-বিভক্তির আলোচনায় খুব প্রাসঙ্গিক নয়, স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের কারকতত্ত্বে তো নয়ই। কিন্তু একটা জিনিশ ফিল্‌মোরের বিবেচনা থেকে বুঝতে পারি যে, শুধু অর্থের উপর কারক-বিভাগ করতে গেলে শুধু দু-টা বা আটটা কেন, অসংখ্য ভাগ তৈরি করা যায়। আফ্রিকার কোনো-কোনো ভাষায় পঞ্চাশের বেশি 'কাল' বা **Tense** আছে ধাতুরূপে। সেখানে সেই কালের ঐরকম 'রূপ' আছে বলেই অতগুলি 'কাল' মেনে নেওয়া বলে। তেমনই কারকেও যে-কটা অর্থগত ভাগ আমাদের ব্যাকরণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয় সেই কটাকেই কারক বলে আমরা গণ্য করব বাংলায়। ভাষাতাত্ত্বিকেরা তাই করেন, এবং ডঃ সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (১৩শ সংস্করণ, ১৯৭৯) রূপের, অর্থাৎ কারকসূচক বিভক্তির ভিত্তিতেই বাংলা ভাষায় চারটি কারক নির্দেশ করেছেন।

বাংলাভাষার আরেকটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সংস্কৃতের মতো বিভক্তি-প্রধান ভাষায় যেখানে কেবল বিভক্তি দিয়েই কারক চিহ্নিত হতে পারত বাংলায় সেখানে তা সবসময় হয় না। বাংলাভাষা এখন আর খুব বিভক্তিপ্রধান (inflexional) ভাষা নয়, তা খানিকটা বিশ্লেষ-প্রবণ (analytical) ভাষা। অর্থাৎ এ ভাষায় বিভক্তি ছাড়াও কারক বোঝানোর জন্য প্রায়ই আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'দিয়ে' 'থেকে' 'কাছে', 'জন্য' ইত্যাদি শব্দ বিভক্তির মতো বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে জুড়ে যায় না। এগুলি বিভক্তি নয়, আলাদা শব্দ—ব্যাকরণে এগুলির নাম কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গ। 'অনু' অর্থাৎ পরে আস, তাই অনুসর্গ—ইংরেজিতে Postposition। ইংরেজি ভাষায় এদেরই সমগোত্রীয় 'of', 'for', 'on', 'in' ইত্যাদি শব্দ সম্বন্ধিত শব্দের আগে বসে, তাই সেগুলির নাম 'pre'position। ইংরেজি এবং বাংলায় মিল এখানে যে, দু ভাষাতেই কারক বোঝানোর জন্য বিভক্তি যেমন আছে কোথাও কোথাও, তেমনি তা বোঝানোর জন্য আলাদা শব্দেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। বাংলায় আবার বিভক্তি এবং অনুসর্গ দুটোরই সাহায্য নেওয়া হচ্ছে কোনো কোনো কারকে। যেমন অধিকরণ বোঝাতে 'বইটা টেবিলে আছে' বাক্যে শুধু-'এ' বিভক্তি লাগাচ্ছি 'টেবিল' শব্দটিতে; কিন্তু যখন অনুসর্গ ব্যবহার করে বলছি 'বইটা **টেবিলের ওপরে** আছে তখন টেবিল কথাটির সঙ্গে ষষ্ঠীর-'এর' বিভক্তি লাগাচ্ছি, সেই সঙ্গে 'ওপরে' অনুসর্গটিরও ব্যবহার করছি।

স্কুলের ব্যাকরণের জন্য রূপের দিক থেকে বাংলা কারকগুলিকে বিভক্তি প্রধান কারক এবং অনুসর্গ-প্রধান কারক—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। আর একটি শ্রেণী হতে পারে শব্দবিন্যাস প্রধান। তার কথায় পরে আসছি। কারকে 'কেস্' অর্থে মেনে নেওয়াই ভালো—ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখেরা যেমন নিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে নতুন অর্থে কারক আর ক্রিয়ান্বয়ী থাকে না, বাক্যে প্রযুক্ত হবার জন্য বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দগুলি যে রূপ, অবস্থান বা 'শব্দ-সম্বন্ধ' (অনুসর্গের সঙ্গে যেমন) লাভ করে তাই কারক হয়ে দাঁড়ায়। সে হিসেবে বাংলায় বিভক্তি প্রধান কারক হল তিনটি—কর্ম ('-কে','-য়' ইত্যাদি দিয়ে চিহ্নিত), সম্বন্ধ ('-র','-এর' দিয়ে চিহ্নিত) এবং অধিকরণ ('-এ', '-তে', '-য়' দিয়ে নির্দেশিত)। আর অনুসর্গ-প্রধান কারক হল দুটি: করণ ('দিয়ে' 'দ্বারা' যুক্ত) এবং অপাদান ('থেকে' 'হতে' যুক্ত)।

কিন্তু বিভক্তিপ্রধান কর্তৃকারক কি বাংলায় নেই? কেউ কেউ বলবেন, অনির্দিষ্ট কর্তা বা পশুপাখি কর্তা হলে '-এ' '-তে' বিভক্তি তো পাচ্ছি: যেমন 'লোকে বলে' 'গোরুতে ঘাস খায়', 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' 'পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না 'খায়'। এ ধরনের প্রয়োগ ভাষার একটি অতিশয় সংকীর্ণ অংশে সীমাবদ্ধ। তা ব্যাপক নয়। পূর্ববঙ্গের উপভাষাতে অবশ্য এর প্রয়োগ ব্যাপক। প্রাচীন কর্মবাচ্যের অনুক্ত কর্তার '-এন' বিভক্তির ভগ্নাবশেষ ঐ '-এ' -র সঙ্গে সপ্তমীর '-এ' ও '-তে' মিশে গিয়ে এই কর্তৃকারকের জন্ম দিয়েছে। এই কর্তৃকারককে আমরা একটি গৌণ কারকের শ্রেণীতে ফেলতে পারি, যে-কারক অন্য কারকের বিভক্তি ধার করে দুর্বল ভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

তাহলে ভাগ দাঁড়াচ্ছে মূলত বিভক্তিপ্রধান ও অনুসর্গ-প্রধান কারকে। এ দুয়েরই আবার সবল (strong) ও দুর্বল (weak)—দুটি করে ভাগ আছে। সবল হল তার প্রধান ভাবে স্বীকৃত রূপ। আর দুর্বল হল তার গৌণ রূপ। যেমন যে-বিভক্তি প্রধান কারক দুর্বল, বুঝতে হবে তার নিজস্ব বিভক্তি কিছু নেই, অন্য কারকের বিভক্তি সে ধার করে চালাচ্ছে। আর তার ঐ রূপটির প্রয়োগও ব্যাপক নয়। আর যে অনুসর্গ-প্রধান কারক দুর্বল—বুঝতে হবে, অনুসর্গ প্রধান রূপ সে কারকের প্রধান রূপ নয়। যেমন 'তোমার জন্যে এ বইটা এনেছি' এতে 'কর্ম'

কারকের একটা রূপ পাচ্ছি 'তোমার জন্য' কথাটায়। সংস্কৃতে হলে 'নিমিত্তার্থে চতুর্থী' বিভক্তি হত, কিন্তু বাংলায় বিভক্তি না হয়ে 'বিভক্তি+অনুসর্গের' প্রয়োগ হয়। এখানে কর্ম কারকেরই একটা গৌণ বা দুর্বল রূপ ঐ অনুসর্গ-প্রধান চেহারা নিয়েছে। এ দিক থেকে লক্ষ করব, একাধিক বাংলা কারক একই সঙ্গে বিভক্তি প্রধান এবং অনুসর্গ প্রধান—দু রকম চেহারাই নিতে পারে। কিন্তু এর কোনোটি মুখ্য, কোনোটা গৌণ। দুয়ের প্রয়োগ ব্যাপ্তি সমান নয়।

শব্দ-বিন্যাস প্রধান কারকে শুধু বিভক্তি বা অনুসর্গ থাকে না, শব্দবিন্যাসেরও বৈচিত্র্য থাকে। যেমন 'আমার রাগ হচ্ছে' এতে 'আমি' যদি কর্তৃকারক হয়, তার জন্য 'আমি' না হয়ে হচ্ছে আমার', আর 'হওয়া' ক্রিয়াটির প্রয়োগ হচ্ছে কিন্তু এ ক্রিয়ার কর্তা 'আমি' নয় 'রাগ'। 'মাথা ধরা' 'মন কেমন করা' 'মনে পড়া' ইত্যাদি সংযোগমূলক ক্রিয়ার এই বিশেষ বিন্যাস ঘটে।

ফলে এই সঙ্গে আমরা কারকের নামগুলিকেও বদল করার কথা ভাবব একটু। 'কর্তা' নামটি কাজের, কিন্তু তার বিষয়ে সমস্যা আছে। 'কর্তা' আর 'উদ্দেশ্য'—ব্যাকরণের এই দুটি ধারণাকে পৃথক রাখা প্রায়ই খুব কঠিন হয়ে পড়ে। 'আমি বাড়ি যাব'—তে আমি একই সঙ্গে 'কর্তা' এবং 'উদ্দেশ্য' (Subject)। কিন্তু 'আমার পছন্দ হয়নি' তে 'আমি' কর্তা হলেও উদ্দেশ্য নয়, 'উদ্দেশ্য' "আমার পছন্দ"। বাক্য গঠনের প্রকাশস্তরে বা **Surface**-এ ক্রিয়ার কর্তা তার 'উদ্দেশ্য' কিন্তু গভীরে বা deepstructure-এ তার কর্তা আলাদা। আমরা যেহেতু আপাতত প্রকাশ স্তরে চিহ্নিত কারকের কথাই ভাবছি 'আমার কষ্ট হচ্ছে', 'আমার ভালো লাগছে না' 'আমার খাওয়া হল',—ইত্যাদি বাক্যের 'আমি'-কে কর্তৃকারক হিসেবে আমরা দেখাব না। বরং আরেকটা কারকের নাম ভাবতে পারি। এর প্রকাশ কিন্তু না হচ্ছে বিভক্তিতে, না হচ্ছে অনুসর্গে। এর প্রকাশের উপায়টি মজার। আনন্দ হওয়া, দুঃখ হওয়া, পছন্দ হওয়া, ভালো লাগা ইত্যাদি কতকগুলি বিশেষ ধরনের মিশ্র ক্রিয়াপদের উদ্দেশ্য কর্তা সব সময় ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত হয়, যেমন হয় কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের কর্তা। এই কারকেই শব্দবিন্যাস নির্ভর। একে আমরা 'অনুমিত কর্তা' নামও দিতে পারি। তাহলে বাংলা কর্তৃকারক একটি গৌণ কারক এবং তার দুটি রূপ : একটি বিভক্তিপ্রধান। তার নাম 'অনির্দিষ্ট কর্তা', আর একটি শব্দবিন্যাসনির্ভর, তার নাম 'অনুমিত কর্তা'। অনির্দিষ্ট কর্তায় 'এ' বা 'তে' বিভক্তি অনুমিত কর্তায় ষষ্ঠী 'র' বা 'এর' বিভক্তি, সেই সঙ্গে আরো কিছু বিন্যাস। দুইই মূলত

অন্য কারকের বিভক্তি—ধার-করা। সেজন্যে কর্তৃকারক মাত্রেই বাংলায় গৌণ কারক বা দুর্বল (weak) কারক।

এবার আসি 'কর্ম'-এর কথায়। ক্রিয়ার 'কর্ম' আর কর্মকারক এক নয়। বাংলায় এই সব বাক্যে আমরা বিশেষ বিশেষ শব্দে -'কে' (স্থানবিশেষে কিন্তু এখন কম ক্ষেত্রে -'রে'—'য়') ব্যবহৃত হতে দেখি। বাংলায় অনেক সকর্মক ক্রিয়ায়—যেগুলিকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বা two object verb বলা হয়—দুটি করে কর্ম থাকে। একটি মুখ্যকর্ম, আরেকটি গৌণকর্ম—direct object ও indirect object। বাংলায় মুখ্য হোক গৌণ হোক, কেবল সজীব ও মানব কর্ম হলেই তার সঙ্গে বিভক্তি লাগে। যেমন 'বইটা এখানে নিয়ে এসো'—এ বাক্যে "বইটা" মুখ্যকর্ম, কিন্তু এতে কর্মকারকের চিহ্ন লাগল না। এর বদলে যদি বলি 'তোমার ভাইকে এখানে নিয়ে এসো', তখন দেখছি "ভাই" কথাটার সঙ্গে 'কে' জুড়ছে। দুটোই মুখ্যকর্ম, কিন্তু "বইটা" অ-প্রাণী, সুতরাং তাতে বিভক্তি লাগছে না; "ভাই" প্রাণী এবং মানব, ফলে তাতে বিভক্তি লাগছে। মুখ্যকর্মের ক্ষেত্রে মানবেতর প্রাণী হলে '-কে' লাগালেও চলে, না লাগালেও চলে, যেমন 'গোরুটা এখানে নিয়ে এসো', 'গোরুটাকে এখানে নিয়ে এসো'—দুইই গ্রাহ্য। কিন্তু গৌণকর্মে সজীব প্রাণী হলেই হল; 'কে' লাগাতেই হবে—'গোরুটাকে খাবার দাও', 'সেজমামাকে টাকা দাও'।

তাহলে মুখ্যকর্মের ক্ষেত্রে যে-শব্দের দ্বারা সজীব ও মানব বোঝায় তাতে, এবং গৌণকর্মের ক্ষেত্রে কেবল সজীব প্রাণীবাচক শব্দে বিভক্তি যোগ অবশ্য-কর্তব্য। দুটোতেই ঐ সজীব প্রাণী সাধারণ লক্ষণ—বলতে পারি ক্রিয়ার লক্ষ্যও বটে। তাহলে পরিভাষা আরো সহজ ও স্বচ্ছ করার জন্য 'কে' ওয়ালা কারকটিকে আমরা 'লক্ষ্য' কারক বলতে পারি, এমন-কী 'উদ্দিষ্ট' কারকও বলা চলে।

বিভক্তিপ্রধান কারকের তৃতীয় শ্রেণী হল সম্বন্ধ কারক। এতে স্বরান্ত শব্দের ক্ষেত্রে-'র' বিভক্তি এবং অর্ধস্বর ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের ক্ষেত্রে-'এর' বিভক্তি লাগে। বাংলায় এই কারক খুব স্পষ্ট ও ব্যাপক, এমন-কী অন্য কারকের ক্ষেত্রেও সম্বন্ধ কারক তার বিভক্তি ধার দেয়। সম্বন্ধ কারকের নির্ণয় এবং পরিভাষা—কোনোটা নিয়েই তেমন সমস্যা নেই, কাজেই এর নাম যা আছে তাই মান্য।

চতুর্থ বিভক্তিপ্রধান কারক হল, অধিকরণ—যাতে স্থান ও কালবাচক শব্দের সঙ্গে 'এ'-'য়' ও-'তে' বিভক্তি লাগানো হয়। ব্যঞ্জনান্ত ও অর্ধস্বরান্ত শব্দে-'এ',

স্বরান্ত শব্দের শেষে-'তে', এবং অন্-ঊর্ধ্ব স্বরান্ত [আ, ও, এ—বাংলা শব্দের শেষে এই তিনটি অন্-ঊর্ধ্ব অর্থাৎ নিম্ন ও মধ্যস্বরকে আমরা পাই—'আ' নিম্ন, বাকি দুটি মধ্য] শব্দের শেষে বিকল্পে-'য়' লাগে। -'য়'-'এ'-র একটি রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। এ কারকের উদাহরণ—শিকাগোয়, বাঁশবেড়েয়, কলকাতায়, বেলা দুটোয়, তিনটেয়, জানুয়ারিতে, গত মাসে। এখানে 'অধিকরণ' শব্দটির মানে ছাত্রছাত্রীদের কাছে অস্পষ্ট, ফলে 'আধার' কারক বা 'আশ্রয়' কারক নাম দেওয়া যেতে পারে।

বিভক্তিপ্রধান কারকের মোটামুটি তালিকা এই। এবার অনুসর্গপ্রধান দুটি কারকের কথা। করণ কারকের আমরা নতুন নাম দিতে পারি 'সহায়ক' কারক তাতে অনুসর্গ লাগছে, কিন্তু অনুসর্গের ক্ষেত্রে যেমন হয়, মূল শব্দটিতে বিভক্তি জুড়ে তারপরেই অনুসর্গ বসছে। কী বিভক্তি, সেটা নির্ভর করে কোন্ অনুসর্গ বসছে, এবং মূল শব্দটা কী, তার উপরে। 'আপনি আপনার ভাইকে দিয়ে চিঠিটা পাঠাবেন' এবং 'আপনি এ কলমটা দিয়ে লিখে দেখুন'—এ দুটো বাক্যে অজীব শব্দ "কলমটা"র পরে শুধুই "দিয়ে" বসছে, আর প্রাণীবাচক "ভাই"-এর সঙ্গে-'কে' জুড়ে, তারপর "দিয়ে" লাগছে। 'দ্বারা' অনুসর্গের বেলায় আধুনিক বাংলায় আবার সম্বন্ধের-'র/-এর' বিভক্তি দরকার—রামের দ্বারা, আমা-র দ্বারা।

'সহায়ত' কারক মূলত অনুসর্গপ্রধান হলেও এর একটা গৌণ বা দুর্বল রূপ আছে, যাতে ধার-করা বিভক্তির ব্যবহার হয়। যেমন 'এ কল**মে** লিখতে পারব না', 'দুমুঠো ভা**তে** আমার খাওয়া হবে না', 'এ কটা টাকা**য়** সংসার চলে কী করে?' এ বিভক্তিগুলি অধিকরণ বা 'আধার'/'আশ্রয়' কারকের—করণ কারক সেগুলিকে ধার করে কাজে লাগাচ্ছে।

অপাদানও অনুসর্গপ্রধান কারক। এর নতুন নাম দেওয়া যেতে পারে 'উৎস' কারক—যাতে উৎস বা উদ্ভবস্থল বা আরম্ভসূত্র দেখিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ কথায় 'থেকে' অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়। 'থেকে' থাকলে মূল শব্দে সাধারণভাবে কোনো বিভক্তির দরকার নেই, কেবল তুলনাপ্রসঙ্গেই 'থেকে'-র ব্যবহারে মূল শব্দে-'র/-এর' জুড়তে হয়—'আমার থেকে ছোটো', 'ওটার থেকে খারাপ'। তা কারকের মধ্যে আসে কি না সন্দেহ, এলে ঐ অপাদানের বা 'উৎসের' মধ্যেই ঢুকিয়ে দেওয়া চলে। উৎস কারকের একটি গৌণ চেহারা আছে ধার-করা বিভক্তি নিয়ে—'মেঘে বৃষ্টি হয়' 'তিলে তেল হয়' ইত্যাদি।

তাহলে নতুন পরিভাষা ও সংজ্ঞার্থ নিয়ে বাংলা কারকক্ষে আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি :

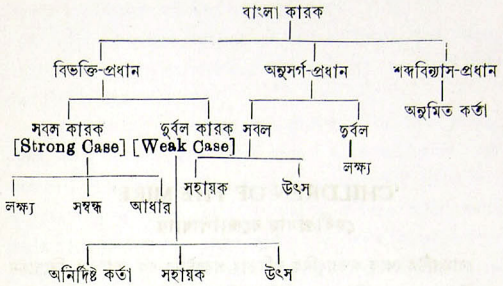

প্রচলিত ব্যাকরণের 'সম্প্রদান' কারক বাংলায় রাখার কোনো অর্থ হয় না—একথা অনেকদিন আগেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন। 'সম্বোধন'-ও বাংলায় কোনো কারক নয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপ ও প্রকরণ অনুযায়ী কারক-শ্রেণীর এই নতুন বিন্যাস বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। 'সহায়ক' এবং 'উৎস' কারকের অনুসর্গপ্রধান রূপই 'সবল' রূপ, বিভক্তিপ্রধান রূপগুলি 'দুর্বল' বা গৌণ রূপ। দুর্বল রূপগুলি যে শুধু ধার-করা বিভক্তি ব্যবহার করে তাই নয়, সেগুলির প্রয়োগও সীমাবদ্ধ, **non-Productive**।

আমার মতে সপ্তম শ্রেণীর নিচে কারক-বিভক্তি শেখানোর কোনো অর্থ হয় না। তার পরে, বিভক্তি, অনুসর্গ ও শব্দবিন্যাসের ধারণা দিয়ে স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণে কারকের এই বিভাগ-বিশ্লেষণ যথেষ্ট সংগত হবে কি না—সে বিষয়ে আলোচনা চলা উচিত।

আলোচনা

'CHILDREN OF THE MIRE'

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রোম্যান্টিক থেকে অত্যাধুনিক কবিতার প্রসরটুকুর এক আলেখ্য লিখেছেন অক্তাভিয়ো পাস। লিখেছেন, তিনি সাহিত্যের ঐতিহাসিক নন, অন্তত তিন বার করে বলেছেন এ লেখা পক্ষপাতী লেখা—একজন ইস্পানো-মার্কিন কবির ভূমি থেকে দেখা আধুনিক কাব্য-আন্দোলন এবং 'আধুনিক' এই চেতনার সঙ্গে তার বিরুদ্ধ-সম্বন্ধ (পৃ V, পৃ ৩১, পৃ ১২১), তদুপরি—এ তাঁর নিজের উৎস খোঁজার, নিজেকে নির্ণয় করার পরোক্ষ কৌতূহল। স্মর্তব্য তাঁর পূর্বতন 'এল লাবেরিন্‌তো দে লা সোলেদাদ' : 'নির্জনতার ধাঁধাপথ' যেখানে আধুনিক লাতিনামেরিকান খুঁজছে মেক্‌সিকান্ প্রাগিতিহাস, আত্মপরিচয় পেতে[১] ; কিংবা প্রসিদ্ধ কবিতা 'সূর্যপাথর' এর শিলা-ক্যালেণ্ডারে তক্ষণ করা আস্‌তেক-বিশ্বের সেই রূপক। কবিতা কী? কী তার বক্তব্য? কিভাবে সে সংযোগ করে পাঠকের?—এই তিন মৌল প্রশ্নের জবাব সন্ধান করতে এতথানি এই বইয়ের অবতারণা, 'চার্ল্‌স এলিয়ট নর্টন বক্তৃতা'-অবলম্বনে এই বইয়ের আরো দুটি পূর্ব-গ্রন্থ (বা পূর্ব-লেখ) আছে এ বাবদে—প্রায় পঁচিশ বছর ধরে কবি নিজের কাছে নিজেকে স্পষ্ট করছেন ক্রমাগত। পাসের পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন এই গদ্য তাঁর কবিতার রূপকল্প ঋণী—সুরূপা সঙ্কেতময় বর্ণনা, যেমন :

১ দারিয়ো-র মর্দেনিস্‌মো দুনিয়া ভরে তুলল ট্রাইটন আর মারমেড্-এ, নতুন কবিরা বাণিজ্য জাহাজের যাত্রী এসে নামলেন লিভারপুল, সীথেরিয়ায় নয়···

১ The Labyrinth of Solitude, L. Kemp অনূদিত ১৯৬০

২ মলিনারি, যাঁর বিস্ময়কর খরমধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্ছায়া গাছ···

৩ নন্দন আর নৈতিক শাসনের দরজা-ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলে দেখি শিল্পধ্যান আর যৌনতার, দৃষ্টি আর কামের দ্ব্যর্থ-সম্বন্ধ···

৪ পৃথিবীর নয়, বাতাস-অবকাশের এই ভাষা, উড়ালযাত্রার ভাষা, শব্দবন্ধ হল মধ্য আকাশে খুলে যাওয়া প্যারাশুট, মাটিতে পৌছবার আগে ফেটে গিয়ে বর্ণিল বিস্ফোরণ হয়ে মিলিয়ে যায়···

পাস অবশ্য মানেন, 'ভাষা হল একাধারে ব্যক্তি আর বিশ্ব, ইতিহাস এবং জীবনী, আমি এবং অন্যেরা'—মিলিয়ে যাওয়ার বর্ণিল বিস্ফোরণ নয়। দুই অগম প্রান্ত যোগ দেওয়া শব্দসেতুবন্ধ, বা সংরক্ত যৌনাচার তাঁর যে কবিতা : বহুব্যবহৃত তাঁর সেতু (puente)-চিত্র বা 'বৃন্দাবন' কবিতাও স্মর্তব্য যেখানে হিন্দু-তন্ত্রের যোনিচিহ্ন-পাথর পাসকে সাহায্য করেছে রূপক-নির্মাণে—তত্ত্ব হয়ে এসেছে এই নিবন্ধে; শব্দসেতুর নিচে কবি হয়ে উঠেছেন অনামিত, কাব্য-সুরতির রূপকল্পে ব্যক্ত হয়েছে পাসের সুররিয়ালিস্ট্ পূর্ব-সূত্র। আঁদ্রে ব্রেতঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাস একদা এই শিবিরের গাণ্ডীবী ছিলেন যাকে রোম্যান্টিকতার অতিচার বলে চিহ্নিত করেছেন এই বইয়ে।

পাস তাঁর সঙ্কীর্ণ প্রেক্ষার কথা জোর দিয়ে বললেও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তাঁর লেখার ব্যাপ্তি। ইয়োরোপ-আমেরিকার তন্নতন্ন সমাজেতিহাস ও কলাকাব্যের সূত্র হাতে নিয়ে তিনি বসেছেন, তারও এই কৈফিয়ত উদ্ধৃত করি :

১ আমাদের ভাষা ইয়োরোপের, ভূমি আমেরিকার, দুয়ের যোগে নিষ্পন্ন আমাদের লেখা। পৃ ১৩৭-৩৮।

২ সাহিত্য নিঃসঙ্গ ভাষাপ্রকরণ নয়, অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধিত। পৃ ১২০-২১।

৩ ভাষা-সংস্কৃতির বিরোধ সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পৃথিবীর আধুনিক কবিতা একটাই। পৃ VI।

সচ্ছল বিশ্বনাগরিকের মতো অকাতরে পাস ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর উপকরণ, সে এত অনায়াস যে মনে হয় তত্ত্বসন্দর্ভ নয়, যেন ধর্মনিষ্ঠাবশে বিষয় হয়ে উঠেছে এখানে ব্যক্তিগত উপলব্ধি। পাসের কবিপরিচয়েরও একটি অ-গৌণ লক্ষণ বটে ধর্মিষ্ঠতা। 'জলার সন্ততি' এই যে বাক্যাংশে মুকুটিত এই বই, জাঁ পলের 'স্বপ্ন' কবিতার যীশুকে বিশদ করে লেখা নের্ভালের কবিতাপংক্তি থেকে নেওয়া : **'Celui qui donna l' ame aux enfants du limon'** ; জলার সন্ততির

মধ্যে যিনি নিঃশ্বসিত করে দিলেন আত্মা। পাঁক-কাদায় আমজ্জিত আদম এই সন্তান, দেবতাহীন বিশ্বের দেবতায়ত মানবপুত্র যিনি আবার মরবার জন্য নিয়তি-বদ্ধ। ইস্পানো আমেরিকার আবিষ্কার নয়, এ শিশু আধুনিক আবিশ্বের। রোম্যান্টিকদের মুখ্য একটি বিষয়সূত্র হল দেবতার মৃত্যু। আধুনিক ইতিহাসেরও শুরু এইখান থেকে।

সর্বত ইতিহাসাশ্রয়ী পাসের এই বই। ইতিহাস কালগত, 'আধুনিক' শব্দটিও কালবাচক, কালনিরূপণ করতে গিয়ে পাস সংকলন করেছেন আদি মানুষের হিন্দু বৌদ্ধের সেমেটী-ইসলামীর এবং খৃষ্টানুগামীর আবিশ্ব কালচেতনা। অতীত-শায়ী স্বর্ণ-স্বর্গের অন্ধ পূজারী, অধুনাকে এঁরা বাঁধা রেখেছিলেন সবাই অতীতের হাতে, ফ্রিজিত লহমাতে সেঁটে রাখা এঁদের শ্রেষ্ঠ সুকৃতি। দান্তের নরকে অগ্নি দণ্ড ভোগী ফারিনাতা উবেতি দান্তের ভবিষ্যৎ নির্বাসন-ভবিতব্যের কথা বলে তারপর বললেন, তাঁর দ্বিতীয় দৃষ্টিও তাঁকে ছেড়ে যাবে 'যখন ভবিষ্যতের দরোজা বন্ধ হয়ে যাবে'। 'ইনফের্নো'র এই অংশ উদ্ধার করে পাস বলেছেন, এই কথা যখন ভাবি হাসি পায়, তখনই আবার ভয়ে কেঁপে উঠি। 'আধুনিক' কাল এই প্রথম একের পর এক দুয়োর খুলতে খুলতে চলেছে নিত্যপরিবর্তনময় অন্তহীন ভবিষ্যতের দেশে—পুরাতন, সনাতন, খৃষ্টীয় 'অনন্তে'র বিকল্প তার এই ভবিষ্যৎ। কোনো দেশে কোনো সভ্যতাতে কখনো ছিল না এই 'আধুনিকতা' যার অনন্য-সাধন কেবল বদল, আর বদল, আর বিপ্লব, ক্ষণস্থিতিমাত্রকে ভাসিয়ে দিয়ে এই ক্ষান্তি হারা বহমানতা।

কবি আর বিপ্লবী তা হলে সতীর্থ এই সূত্রে—বর্তমানে অতৃপ্ত; দুজনেই বর্তমানকে ভুলতে চান, ভবিষ্যৎ-লোভে। পাস লক্ষ্য করেছেন, কবি যে-অন্যতর সময়ের দুরাশী সে হল ভাবী কালের—নির্মাণযোগ্য বলে, আবার সে অসম-সমাজব্যবস্থার আগের কালের সেই অজ্ঞাত সহজ সময়ও বটে, ইতিহাসস্পৃষ্ট হবার আগের সময়মুহূর্ত, original innocence : রুশো-র 'শুরুর আগের শুরু', ব্লেকের 'আদম', জাঁ পলের 'স্বপ্ন', ওয়ার্ডসোয়র্থের 'শৈশব', কোলরিজের 'কল্পনা'। অতএব, অতি-ফিউচারিস্ট্ হলেও বিপ্লবীর 'ভবিষ্যতে'র সঙ্গে কবির মিল নেই। আলেকসান্দর ব্লক ধর্ম আর বিপ্লবে মিলিয়ে হয়ে উঠেছেন খৃষ্টান কমিউনিস্ট্, মায়াকভ্স্কির অতীত-প্রত্যাহার ট্রট্স্কির চোখে ধরা পড়েছে বিপ্লবী গণতন্ত্রীর নয়, বোহেমীয় নিহিলিস্ট্এর।

ভাবী কালের নির্বন্ধে অতীত ও বর্তমানকে বলি দেওয়া 'আধুনিক' কালকে

দেখা গেল—ঐতিহ্যশ্লেষলোপী, কেবলই বদল-উন্মুখ ; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সূচিত রোম্যান্টিক—আধুনিকদের কবিস্বভাবও দেখা গেল—অনন্য, স্বতন্ত্র, অনিয়মিত—ধ্রুপদী বিরোধী বলে অনুবৃত্তিরহিত প্রতিদিনের নতুন, 'অদ্ভুত' সুন্দরের সন্ধানী, এবং সেই সঙ্গে নিয়ত মুহূর্তের অন্তর্দ্বন্দ্বিত। বস্তুত কবিশিল্পীরা অতীত-ভবিষ্যৎ দুই কালকেই সঞ্চার করতে চান আশুমুহূর্তে—নিষ্কাল এক বর্তমানে, তার কারণ ইন্দ্রিয় সংবেদ্যের বাইরে তাঁদের জগৎ নেই : 'ভবিষ্যৎ যে কী তা কায়াও জানে না, কল্পনাও না'। কী হবে সেই ভবিষ্যতে? আধুনিক শিল্প নিষ্প্রশ্ন স্বভাব শিল্প নয়, যুক্তিবিচার ও তুলনাবিচারের আবেগোত্থ—**'critical passion'** তার, এই শব্দটি পেলুম। কাজেই আধুনিক যুগ আর আধুনিক শিল্প পরস্পর বিরোধী। পাসের সন্দর্ভের এই হল সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভাগ যেখানে কবিকে তিনি স্বকালের সর্বৈব বিরুদ্ধ বলে নির্ণয় করেছেন। একটি পরমা শিল্পায়তন সমস্ত বদলের মূর্ত প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কবি প্রথাধর্ম ত্যাগ করেছেন কৃত্রিম-সংগঠিত জ্ঞান করে কিন্তু বিজড়িত হয়ে আছেন ধর্মে, ঐতিহ্যনিষেধী সময়খণ্ডে দাঁড়িয়ে তাঁর যত আকুলতা ঐতিহ্যের জন্য, বিপ্লবীর চেয়েও অপরোক্ষ ইউটোপিয়ার কারণে ফরাসী-রুশ-লাতিনামেরিকান কোনো বিপ্লবের সংযুক্ত থাকতে পারেননি শেষাবধি। শার্ল ফুরিয়ে নামে জনৈক বিস্মৃত সোশিয়ালিস্ট্কে এই সত্যদ্রষ্টা-রূপে পেয়ে পাস তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছেন মার্ক্সের উপরে।

পাসের বইয়ে তাঁর নিজস্ব লাতিনামেরিকার তথ্য পাই অধিকন্তু। আমেরিকাভূমির দুটি ভাষা স্পেণীয়-ইংরেজি দুটিই ইয়োরোপের, দেশান্তরে তার চিত্ত ও অভিব্যক্তির যেটুকু ব্যবধান, ইস্পানো-মার্কিনী কবিরা তা এতদূর নিরাকৃত করেছিলেন যে তাঁদের খ্যাতি হয়েছিল অনুবাদক-রূপে। দারিয়ো ও তাঁর অনুগামীদের 'মদের্নিস্মো' আসলে অতিক্রান্ত ফরাসী সিম্বালিস্ট্-পার্নাশিয়ানদের ভাষাসাধনা, ইংরেজি বা ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যাকে 'মডার্নিস্ট' বলে জানি, ইস্পানি দেশে বা উপনিবেশে এসেছে অনেক পরে, 'ভানগার্দিয়া' নামে। সেও আমদানি চিত্তভাগ, কিন্তু নতুন পৃথিবীর প্রয়োজনোপযোগানুযায়ী তার আদল গড়ে উঠেছে নিজস্ব। অবশ্য আধুনিক কবিতার সর্বাত্ম-ঐক্যে পাস বিশ্বাসী : যাই বিভাজিত হোক দেশে দেশে, 'প্রতিটি রচনাই একাধারে অনন্য ও পারস্পরিক অনুবাদ'। যদি ইয়োরোপের ক্ষেত্রে তা হয়, অন্যত্রও হবার বাধা নেই।

রোম্যান্টিক থেকে উৎসারিত আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতার তথ্য ও আভ্যন্তরজ্ঞানে সমৃদ্ধ এই লেখা। ব্লেক ইয়েট্‌স্ বোদলেয়ার মালার্মে পেসোয়া পাস্তেরনাক—অগণন বিশ্রুত নামের শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পাঠককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান, কখনো ঢোকেন তাঁদের অন্তর্জগতে—অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত পড়ে ওঠেন দুঃসাহসী বিচক্ষণতায় এবং আমাদের মুগ্ধ করেন। অতিসংহত তাঁর আলোচনাপদ্ধতিতে যুক্তি বিশ্লেষণের বেশি অবকাশ নেই, হয়তো সেই কারণে একআধ স্থলে প্রশ্নের নিরসন হয় না। 'আধুনিকতা'-বিষয়টিকে তিনি বলেছেন সর্বতোভাবে পাশ্চাত্য পৃথিবীর, প্রাচ্য দেশ তা হলে তাঁর মতে ব্যুরোক্রেসির ভাষায় যাকে বলে 'অনুন্নত'? সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও টেনে আনা যাবে তা হলে শব্দটিকে? পাসের কবিতায় হিন্দু তন্ত্র প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রাদি দেখেছি, এখানেও হিন্দু-বৌদ্ধ কালচেতনার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু দুয়ের ক্রম বা ভেদ বিষয়ে মনে হয় তাঁর স্বচ্ছ ধারণা নেই। পাস বলেছেন, রোম্যান্টিকেরা কবির অহংকে মুখ্য সত্য রূপে গ্রহণ করলেন গ্রীকোরোমান শিল্পাদর্শকে চ্যুত করে। গ্রীকোরোমান শিল্প কি সর্বৈব নৈর্ব্যক্তিক? কাতুল্লস কি নৈর্ব্যক্তিক? কবি যে স্রষ্টাস্রষ্টা, কবিতা তুকমন্ত্র—এও রোম্যান্টিকদের বহুপূর্ববর্তী, প্রাগার্যকালের। পাস বলেছেন, হিউম এলিয়ট পাউণ্ডের ধ্রুপদীবাদ আসলে আত্মসচেতন রোম্যান্টিকতা, কিন্তু এলিয়ট তো জানি রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ বিধ্বস্ত ইয়োরোপীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন। এই সব যা ত্বরিত মন্তব্যের মতো লাগে এরও কার্যকারণ পাস নিশ্চয় অর্থবহ করে বোঝাতে পারতেন যদি কোথাও কোথাও আরেকটু পরিসর দিতেন।

Children of the Mire Modern Poety from Romanticism to the Avant-Garde,/by Octavio Paz Translated by Rachel Phillips. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetty.

অনুবাদ

॥ মুখবন্ধ ॥

কাফকার বন্ধু ম্যাক্স ব্রড পবলেছেন, এমন লেখক বিশেষ দেখা যাবোনা যাঁর ভাগ্য ফ্রানৎস কাফকার সঙ্গে তুলনীয়। যিনি জীবদ্দশায়, প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত; মৃত্যুর পর, প্রায় রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত। কাফকার এরজন্য কোনো গোপন বেদনাবোধও ছিল না, কারণ, রচনাকর্ম তো তাঁর কাছে 'প্রার্থনারই নামান্তর'। কাফকার মাত্র কয়েকটি গ্রন্থই বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপ ছাড়িয়ে পূর্বপশ্চিমের অন্যান্য ভাষার যথার্থ সাহিত্যে প্রবল এক প্রভাব বিস্তার করেছিল। বলতে গেলে বিশশতকী সাহিত্যের জীবনযাপনই পরিবর্তিত হ'য়েছিল, সাবালক হ'য়েছিল। অথচ কাফকার রচনার তুলনাহীনতা ও মৌলিকতা, তাঁর রচিত চরিত্রের রহস্যময়তা অথবা সেইসব চরিত্রের অনিশ্চিত পরিপার্শ্বিক জগৎ কাফকাপাঠকদের অনেকদিন ধরেই লেখকহিসেবে কাফকার চারিত্র বিষয়ে নানা প্রমাণবিহীন, কল্পনাপ্রসূত ভাবনার সুযোগ দিয়েছিল। ম্যাক্স ব্রড-এর কাফকাগ্রন্থও অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। **বিশেষত ১৯২০ থেকে ১৯২৪ অর্থাৎ কাফকার মৃত্যু পর্যন্ত চারবছরের কোনো খবর এই জীবনীগ্রন্থে নেই। এবং গুস্তাভ যানুখ-এর 'আলাপচারীতায় 'কাফকা' নামক ব্যক্তিগত ডায়ারি এই মূল্যবান কালকে সযত্নে ও বিশ্বাসযোগ্যতায় উপস্থিত করছে। ফলে নিঃসন্দেহে যানুখের এই রচনা গ্যয়টের মত কাফকার পাঠকদের কাছে আবশ্যিক দলিল হিসেবে গণ্য হবে। যানুখ কাফকার সঙ্গে পরিচিত হন ১৯২০'র**

মার্চে। কাফকার জর্নালেও জানুয়ারী ১৯২০ থেকে অক্টোবর ১৯২১ পর্যন্ত সময়ের কোনো উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এই অংশগুলো খোয়া গিয়েছে। ফলত যানুখের এই গ্রন্থ আরও অধিক মূল্যবান দলিল হিসেবে গ্রাহ্য হয়।

'আলাপচারীতার' যথার্থতা বিভিন্ন কাফকা—পণ্ডিতদের সঙ্গে ম্যাক্স ব্রডও পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে কোনো সন্দেহের আজ আর অবকাশ নেই।

কাফকা কথা বলার সময় অত্যন্ত ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করতেন—যা তুলনায় তাঁর লিখিত বাক্যবন্ধের বিপরীত। তাঁর কথ্যভাষা ছিল গভীরভাবে স্বতন্ত্র, যদিও এরজন্য তাঁকে কখনো চেষ্টা করতে হ'তো না। এবং এইসব যানুখের রচনাতেও প্রত্যক্ষ। এসবই ম্যাক্স ব্রড-এর গবেষণার বিষয়।

যানুখের এই গ্রন্থ রচনার পটচিত্র রচনাটির প্রথমেই বলা হয়েছে। তৎসহ লেখক নিজেকেও স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন সেখানে। যানুখ কিছু কবিতা লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন কাফকা চেক ভাষায়, কিন্তু সার্থক হয়েছেন এই গ্রন্থ রচনার দ্বারাই। যানুখের সম্পর্কে তারিখতিথি সম্বলিত পরিচিতি বাস্তবিক অপ্রতুল। ১৯৪৭-এ যানুখ একটা চিঠিতে ব্রডকে লিখছেন: 'জানিনা আপনার আজও আমাকে মনে আছে কিনা। আপনি চিরকালের জন্য প্রাহা ত্যাগ করবার কিছু পূর্বে যে সঙ্গীতকার বিষয়ে প্রাজের তাগব্রাং কাগজে লিখেছিলেন—আমি আসলে সেই ব্যক্তি। আবার চেক ভাষায় যোসেফ ফ্লোরিন যে মেটামরফোসিস বইটি প্রকাশ করেছে তার জন্যও আমিই দায়ী।' এই ভূমিকার পর যানুখ জানালেন তাঁর ডায়ারির কথা। যদি বইটা প্রকাশ করা যায়। লিখেছেন, 'ফ্রানৎস কাফকা আসলে আমার যৌবন—আরও অনেক কিছু। ফলত, আপনার পক্ষে আমার আন্তরিক উত্তেজনা সহজেই অনুমেয়।' এই মানসিক তারুণ্য থেকেই যানুখ নামক দুর্বলচরিত্রের এক দুর্বল কবি কাফকাকে তাঁর কবিতা পাঠ করতে দিয়েছিলেন। আর তাই তখন থেকে তাদের দুজনের মধ্যে এক মমতার বন্ধন গ'ড়ে উঠল—দিনের পর দিন প্রাহায় পথে পথে পার্কে পার্কে দুজনের পদচারণার—আলাপনের মধ্যে দিয়ে গ্রথিত হ'তে লাগল এই তীব্র অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ। যা পাঠ করলে ক্রমাগত উন্মুক্ত হ'তে থাকে কাফকার রহস্যাবৃত পরিমণ্ডলের এক একটি কপাট। কাফকাজীবনের এই রহস্যাবৃত ও অজানা অংশের বিবরণ বোধহয় বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে—

লেখক।

আলাপচারীতায় কাফকা

গুস্তাভ যানুখ

ভাষান্তর কমলেশ চক্রবর্তী

ফ্রানৎস কাফকার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯২০ তে।

১৯২৬ এ তা মেটামরফোসিস গল্পটির চেক সংস্করণের সঙ্গে—যার অনুবাদক ছিলেন লুডভিগ প্রানা ও প্রকাশক যোসেফ ফ্লোরিন—আমি যুক্ত হয়েছিলাম।

১৯২৬-এর গ্রীষ্মকালে আমি কাফকার ছয়টি গল্প, আ কার্টি ডক্টর বই থেকে অনুবাদ করি যোসেফ ফ্লোরিন-এর জন্য। চেক ভাষায় ছয়টির মধ্যে মাত্র একটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'আ ডিম' নামক গল্পটি কেবল ১৯২৯ এ জর্মান চিত্রশিল্পী ওটো কোয়েস্টার কৃত তা মেটামরফোসিস গল্পের বিষয়ের উপর ছয়টি মূল এচিং-এর মুখবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়।

* * *

এই সময়ে যোসেফ ফ্লোরিন আমাকে আমার ফ্রানৎস কাফকা বিষয়ক, সব নোটস ও টীকাটিপ্পনিগুলো চেক ভাষায় প্রকাশের জন্য ডায়ারি থেকে গুছিয়ে দিতে বলেন।

সুতরাং ডায়ারির প্রয়োজনীয় অংশগুলো ও অন্যান্য নোটস একটা পাণ্ডুলিপি আকারে তৈরি ক'রে যোসেফ ফ্লোরিনকে দিলাম। কিন্তু যেহেতু আমার সঙ্গে এর পরই যোসেফ ফ্লোরিনের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেল, ফলে সেই পাণ্ডুলিপি কখনো আর প্রকাশিত হয় নাই।

এরপর আমার অস্থির জীবনের দীর্ঘ দিন ঘুরে বেড়ানোর সময় এলো, তারপর দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা এবং বর্তমান সময়ের নানাবিধ সমস্যা। আমার অভিজ্ঞতা হল, মৃত্যু ভয়ের, অত্যাচারের ও কারাগারে নিক্ষেপের। পাশবিক ক্ষুধা, নোংরা, ঠাণ্ডা, সরকারি মহলের নৃশংসতা, বিশৃঙ্খলা, এ সবই ছিল তখনকার আপাত যুক্তিগ্রাহ্য জগতের অন্তর্বর্তী চিত্র। কাফকার ছায়াদের প্রোদোষের রাজত্ব প্রতিদিনের সাধারণ অভিজ্ঞতার যথার্থ চিত্র ব'লে মনে হ'তো।

* * *

মনে পড়লো তিনি একদিন আমাকে বলছিলেন, "একটা বিশেষ গল্প শোনার মতো উপযুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয় তৈরি হবার আগে প্রায়শঃই অনেক বৎসর কেটে যায়। কিন্তু মানুষ তো অবশ্যই মরণশীল—আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন ছিলেন অথবা

অন্যসব যা কিছু আমরা ভালোবাসি বা ভয় পাই—সব শেষ হয়, আমরা তাদের যথার্থ বুঝতে পারার আগেই।"

আমি তাঁর কণ্ঠস্বর যেন পুনরায় শুনতে পেলাম, দেখতে পেলাম তাঁর দফতর, তাঁর ডেস্ক, আর তাঁর জানালার বাইরে সেই পুরাতন প্রাহা হোটেল, জুম গোলডেনেন ফাসাম-এর হলুদ প্রাচীর।

মনে পড়লো সেই কতো কাল পূর্বে যোসেফ ফ্লোরিনকে দেওয়া আমার পাণ্ডুলিপির কথা। খুঁজতে লাগলাম আমার বই ও কাগজপত্র, আমার গৃহে ও আমার বন্ধুর গৃহে এবং পেয়ে গেলাম জর্মান ও চেক উভয় ভাষায় কৃত, মূল, হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির খসড়া। আশ্চর্য, সেইসব অচেনা অথচ খুবই পরিচিত ছত্রগুলোয় আমি যেন কুড়ি বছরের আগেকার আমার আমিকে খুঁজে পেলাম। এর অনেক অংশ অবশ্য তখন অর্বাচীন ব'লে মনে হ'ল। হয়ত বা আমি মহানন্দে সেইসব খুঁটিনাটি বদলে দিতাম কিন্তু মনে হল যেন এই অর্বাচীন খুঁটিনাটিতেই ধরা পড়ছে কাফকার দীর্ঘদেহের একটু কুঁজো যথার্থ ছায়া।

ফলে শুধুমাত্র নির্বাচন, সংস্থাপন ও আমার পুরনো স্মৃতির পরিবেশনের কর্মেই সীমিত থাকলাম।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি সময়ে একদিন রাত্রির ভোজনের সময় আমার পিতা আমাকে তাঁর দফতরে পরের দিন সকালে দেখা করতে বললেন।

'আমি জানি তুমি শহরের লাইব্রেরিতে যাবার জন্য অনেকদিন স্কুল কামাই দেও'; তিনি বলছিলেন, 'তাই কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে তুমি আসতে পারবে। ভালো জামাকাপড় পড়ে এসো। আমরা একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

আমি জিগগেস করেছিলাম, কোথায় যাচ্ছি দুজনে।

মনে হল যেন আমার ঔৎসুক্যে তাঁর বেশ মজা লেগেছে। ফলে আমাকে কোনো কিছু তিনি খুলে বললেন না।

'প্রশ্ন করো না' তিনি বলেছিলেন, 'ঔৎসুক্য ভালো না, কিন্তু চমকের জন্য প্রস্তুত থেকো।'

পরদিন দুপুর নাগাদ আমি শ্রমিকদের আকস্মিক বিপদবীমা সংস্থার তিন তলায় তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। আমার আগাপাস্তলা দেখে, ড্রয়ার খুলে তিনি একটা সবুজ ফাইল, উপরে গুস্তাভ লেখা টেবলের উপর রাখলেন।

খানিকটা তাকিয়ে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো।' আমার মুখের বিব্রত ছায়া দেখে বাবার চোখে এক দুষ্টুমির ঝিলিক ফুটে ছিল। 'ভয়ের কিছু নেই', বন্ধু যেমন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে তেমনি ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কবিতা লেখ?' যেন এই কাজের জন্য তিনি আমাকে একটা খরচের বিল দেবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করে জানলে? কি করে বুঝতে পারলে?'

'এতো খুবই সহজ', তিনি বললেন, 'প্রত্যেক মাসে আমি বেশ বড়ো অঙ্কের বিদ্যুতের বিল পাই। কারণটা খুঁজতে গিয়ে দেখি গভীর রাত পর্যন্ত তোমার ঘরে আলো জ্বলে। দেখি, তুমি ক্রমাগত কিছু লিখছ, আর ক্রমাগত তা ছিঁড়ে ফেলছ। একদিন আবিষ্কার করলাম একটা কালো নোটবুক, তাতে লেখা 'অভিজ্ঞতার বই'। কিন্তু এটা তোমার ডায়েরি। তাই না পড়েই রেখে দিলাম। পেলাম আর একটা গাঢ় রং-এর পোর্টফোলিও, নাম 'সৌন্দর্যের বই'। তার অনেকগুলো আমি বুঝতে পারি নি। কিছু বোধকরি মূর্খামি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাই লেখাগুলো সত্যিকারের যাচাই করাব ব'লে আমি কবিতা-গুলো টাইপ করিয়ে পুরো ফাইলটা ডঃ কাফকাকে দিয়েছিলাম তাঁর মতামতের জন্য।

'ডঃ কাফকাকে? তুমি তো কোনোদিন এর নাম আমাদের বল নি?"

'ঠিক। ইনি আমাদের আইন বিভাগে কাজ করেন। আসলে ইনি ম্যাক্স ব্রড-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ম্যাক্স ব্রড তাঁর উপন্যাস 'টাইকো ব্রাহেস্ ওয়ে টু গড' এঁকেই উৎসর্গ করেছেন।'

'ইনি তো 'দ্য মেটামরফোসিস' এর লেখক!' আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো, 'উঃ কী অসাধারণ গল্প। তুমি তাঁকে চেন?'

'তিনি আমাদের আইন বিভাগে কাজ করেন।'

'কী বলেছেন তিনি আমার কবিতা বিষয়ে?'

'প্রশংসা করেছেন। আমি ভেবেছিলাম সেটা কেবলমাত্র ভদ্রতা। তবে পরে তিনি তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। আমি বলেছি তুমি আজকে আসবে।'

'তবে এই দেখা করার কথাই তুমি বলেছিলে?'

বাবার সঙ্গে দ্বিতলে নেমে গেলাম। সেখানে বেশ বড়ো একটা সাজানো গোছানো ঘর।

দুটো ডেস্কের একটার পেছনে বসে ছিলেন দীর্ঘকায়, মেদহীন একজন মানুষ। কালো চুল পেছনের দিকে ঠেলে আঁচড়ানো, নাসিকার হাড় বেশ স্পষ্ট, চমৎকার ধূসর-নীল দুচোখ উল্লেখযোগ্য সরু কপালের ঠিক নিচেই। তিক্তমধুর হাসিমাখা দুইঠোঁট।

'এ নিশ্চয়ই সে', তিনি আমাদের আপ্যায়নের বদলে বললেন।

'সেই তো' বাবার উত্তর।

ডঃ কাফকা হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। 'আমার সামনে তোমার লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। জানো, আমাকেও বেশ মোটাটাকার ইলেকট্রিক বিল দিতে হয়'। তিনি হেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হ'য়ে গেল।

'ইনি-ই তাহলে সেই রহস্যময় সরীসৃপ, সামসার সৃষ্টিকর্তা' মনে মনে ভাবলাম; আমার সামনে এই সহজ,সরল,ভালোমানুষটি দেখে যেন মোহভঙ্গ হল।

'তোমার কবিতায় অত্যন্ত বেশি কোলাহল, বললেন ফ্রানৎস কাফকা। আমার পিতা তখন আমাদের কথা বলতে সুযোগ দিয়ে চলে গেছেন। 'এ হচ্ছে যৌবনের বর্জিত অংশ, এটা জীবনীশক্তির প্রাচুর্যই বোঝায়। এই কোলাহল নিজে নিজেই সুন্দর, যদিও এর সঙ্গে শিল্পের কোনো যোগ নেই। পক্ষান্তরে, এই কোলাহল অভিব্যক্তির নৈপুন্য নষ্ট করে। কিন্তু আমি তো সমালোচক নই, আমি দ্রুত নিজেকে অন্যকিছুতে পরিবর্তিত করতে পারিনা, অতঃপর আমার পূর্বের স্থানে ফিরে এসে এই দুইয়ের দূরত্ব ঠিকঠাক পরিমাপ করতেও সক্ষম নই। যেমন বললাম—আমি সমালোচক নই। আমি কেবল একজন বিচারাধীন মানুষ এবং একজন দর্শকমাত্র।'

'এবং একজন বিচারক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি কেমন একটু বিহ্বল হাসি ফোটালেন।

'সত্যিই আমি বিচারালয়ের নকিব, তবুও তো আমি বিচারককে চিনি না। সম্ভবত আমি একজন সাধারণ সহকারী নকিব মাত্র। আমার নির্দিষ্ট কোনো পদ নেই।' কাফকা হাসলেন।

আমিও তাঁর সঙ্গে হাসলাম, যদিও আমি তাঁর কথা কিছুই অনুধাবন করতে পারিনি।

'একমাত্র যথার্থ, গ্রাহ্য হচ্ছে শাস্তি ভোগ' বিশেষ অভিনিবিষ্ট ভাবে বললেন 'কখন তুমি লেখ?'

প্রশ্নটায় আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম বলেই দ্রুত উত্তর দিলাম: 'অপরাহ্ণে, রাত্রে। দিনের বেলায় খুবই কম। দিনে আমি লিখতেই পারি না।'

'দিনের একটা বিশাল মোহিনী মায়া আছে।'

'আলোয়, কারখানা, বাড়িঘরদোর, রাস্তার দিকে খোলা জানালা সব আমার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। সবকিছু আলোয়। আলো আমার মনোযোগ ছিন্ন করে।'

'হয়ত বা আলো,' ভেতরের অন্ধকার থেকে মনোযোগ ছিন্ন করে। যখন আগে একজনকে পরাভূত করে পুরোপুরি—তখনকার অবস্থাটা ভালোই। যদি সেই সেই সব ভয়ঙ্কর নিদ্রাহীন রাত্রিগুলোর অস্তিত্ব না থাকতো তবে হয়ত আমি কোনোদিন কোনো রচনা করতুম না। কারণ এই সব সময় সর্বদা আমাকে নিজের ভেতরের অন্ধকার নিঃসঙ্গতার দিকে ফিরিয়ে নেয়।'

'ইনি কী নিজেই সেই ভাগ্যহীন 'গ্র মেটামরফোসিস'-এর সরীসৃপ নন?' আমার মনে হল। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম যখন দরোজা খুলে আমার পিতা ভেতরে ঢুকলেন।

* * *

কাফকার দুচোখ আয়ত ধূসর ঠিক ঘন কালো দুই ভ্রূর নীচেই। তাঁর বাদামী মুখ খুবই প্রাণবন্ত। কাফকা তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল দিয়ে কথা বলেন। যখনই সম্ভব হয় তিনি কোনো শব্দের পরিবর্তে তার মুখের কোনো পেশীর পরিচালনায় কাজ চালান। একটুকুরো হাসি, চোখের ভ্রূর সংকোচন, অপ্রশস্ত কপালের-কুঞ্চন, ওষ্ঠের প্রসারণ ও সংকোচন—এইসব ইন্দ্রিয়ের পরিচালনাই এক একটা কথিত বাক্যবন্ধের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। ফ্রানৎস কাফকা অঙ্গপ্রক্ষেপণ পছন্দ করেন আর তাই এর ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট কৃপণ। তাঁর একটা ভঙ্গী কখনোই তাঁর কোনো বাক্যের সহযোগী হয় না, অর্থাৎ শব্দের দ্বিত্ব ঘটায় না। এটা আসলে ভাব বিনিময়ের একটা মাধ্যম, অর্থাৎ কোনোভাবেই তা অনৈচ্ছিক প্রতিক্ষেপণ নয়, পক্ষান্তরে ঐচ্ছিক প্রকাশের যথার্থ মাধ্যম। করতল জোড়া করা, খোলা করতল টেবলের ওপর প্রসারিত রাখা, শরীরটা আরামে পেছনে ঠেসান দেওয়া অথবা উত্তেজিত ভাবে চেয়ারে খাড়া বসে থাকা, কাঁধের প্রক্ষেপে মস্তক সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া, হৃদপিণ্ডের উপর হাতের চাপ, এগুলো তাঁর মাঝেমাঝে ব্যবহৃত ভাব প্রকাশের কয়েকটি মাধ্যম যা তিনি

সর্বদাই এক ক্ষমাপ্রার্থীর অপ্রস্তুত হাসির সঙ্গে ব্যবহার করেন—যেন বলতে চাইছেন, 'যথার্থ, আমি স্বীকার করছি, আমি একটু খেলছি ; যদিও আমার বিশ্বাস আমার এই খেলা আপনার খুব একটা অপছন্দ হচ্ছে না। এবং আসলে—আসলে, আমি এই ব্যাপারটা করছি যাতে আপনার আস্থা আমার উপর অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও বর্তায়।'

'ডক্টর কাফকা তোমার বিশেষ অনুরক্ত', আমি বাবাকে বললাম 'তোমরা পরস্পরের পরিচিত হ'লে কী করে ?'

'অফিসের কারণেই আমরা পরস্পরকে চিনি' বাবা বললেন। 'আমি যখন কাউইনডেক্স আলমারিটার ছবি এঁকে দিলাম তখন থেকেই আমরা পরস্পরের বিশেষ পরিচিত হ'য়ে উঠলাম। ডক্টর কাফকা আমার তৈরি মডেলটা দেখে বেশ প্রীত হয়েছিলেন। আমরা বাক্যবিনিময় আরম্ভ করলাম, এবং তিনি আমাকে বললেন অফিসের ছুটির পর তিনি কারোলিনেনথাল-এর ছুতোর কর্ণহাউজার-এর কাছে কাজ শেখেন। তখন থেকেই আমরা প্রায়ই ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালু করলাম। তারপর তোমার কবিতা তাঁকে দিলাম, এবং এমনি করে আমাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে উঠলো।'

'কেন বন্ধুতা নয় ?'

আমার পিতা মাথা ঝাঁকালেন। 'উনি বন্ধু হবার পক্ষে অত্যন্ত বেশি লাজুক ও গম্ভীরস্বভাবের।

* * *

কাফকার কাছে পরেরবার যখন গেলাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি এখনও কারোলিনেনথাল-এর ছুতোরের কাছে যান ?'

'তুমি এ ব্যাপারটা জান ?'

'আমার পিতা বলেছেন।'

'না। অনেকদিন যাই নি। আসলে আমার, স্বাস্থ্যতে এটা সম্ভব হচ্ছে না। আমার শরীর মহামহিম মহাশয়।'

'আমি বেশ বুঝতে পারছি। ধুলোভরা একটা কারখানায় কাজ করা সহজ নয়।'

'এখানেই তোমার ভুল। আমি কারখানায় কাজ করতে পছন্দই করি। কাঠ চাঁছার গন্ধ, করাতের গুঞ্জন, হাতুড়ির আর্তনাদ, সবকিছুই আমাকে মোহিত

করে। অপরাহ্ণগুলো কত দ্রুত কেটে যায়। সন্ধ্যার আগমন আমার কাছে সর্বদাই বিস্ময়কর।'

'কিন্তু আপনি নিশ্চিত পরিশ্রান্ত হ'য়ে যেতেন।'

'পরিশ্রান্ত, কিন্তু সুখী। সরল, বাস্তব ও সাধারণত প্রয়োজনীয় ব্যবসায় থেকে অন্যকিছু অধিক মুগ্ধকর হতে পারে না। ছুতোরের কাজ ছাড়াও আমি থামার ও বাগানের কাজও করেছি। এ সবই দফতরের চাপানো কাজের তুলনায় অধিক মূল্যবান ও আনন্দদায়ক। এখানে যে কেউ যেন দরকারী জরুরি। কিন্তু তা কেবল উপরে উপরে। বাস্তবে এখানে প্রত্যেকে অধিক নিঃসঙ্গ আর তাই অধিক অখুশি। সবই তাই। বুদ্ধিবাদী পরিশ্রম মানুষকে মনুষ্য-সমাজ থেকে দূরে নিয়ে আসে। হাতের কাজ, পক্ষান্তরে, তাকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যায়। হায়, আমি আর এখন কোনো কারখানায় বা বাগানে কাজ করতে পারি না।'

'আপনি অবশ্যই আপনার চাকরিটা ছাড়তে চাইবেন না ?'

'নয় কেন ? আমি তো স্বপ্ন দেখি যদি কোনো খামারের কাজ অথবা অন্য কোনো হাতের কাজের জন্য সব ছেড়ে প্যালেস্টাইনে গিয়ে থাকতে পারি।'

'আপনি এখানের সবকিছু পেছনে ফেলে যাবেন ?'

'সবকিছু ? যদি আমি এমন একটা জীবন অর্জন করতে পারি যা অর্থপূর্ণ, স্থায়ী ও রমনীয়। তুমি কী লেখক পোল এডলার কে জান ?'

'আমি কেবল তাঁর লেখা বই "দি ম্যাজিক ফ্লুট" জানি।'

'তিনি প্রাহায় থাকেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে।

'কী করেন ?'

'কিছুই না। তাঁর আসলে কোনো পেশা নেই, বৃত্তি আছে। তিনি তাঁর স্ত্রী-সন্তানসহ একজন বন্ধুর কাছ থেকে অন্য বন্ধুর কাছে কেবলি ভ্রমণে কাটান। একজন মুক্ত মানুষ এবং একজন কবি। তাঁর উপস্থিতিতে আমি সর্বদা যেন চৈতন্যে একটা কাঁটা ফোঁটার বেদনা অনুভব করি, কারণ আমি এই দফতরে আমার জীবনকে ক্ষয়িত হ'য়ে যেতে দিয়েছি।'

* * *

১৯২১-এর মে মাসে আমি একটা চতুর্দশপদী লিখলাম যা লুডভিগ ওয়াইণ্ডার 'বোহেমিয়া' কাগজের রবিবাসরীয়তে প্রকাশ করলেন।

কাফকা এই প্রসঙ্গে বললেন : 'তুমি বর্ণনা করেছ কবি হচ্ছেন একজন

মহৎ ও চমৎকার মানুষ, যাঁর পদতল যদিও ভূমিতে নিবদ্ধ শির মিলিয়ে গেছে মেঘের মধ্যে। অবশ্য এটা নিম্নমধ্যবিত্ত চালিত ভাবনাধারার প্রকৃষ্ট প্রতীক। এটা এমন বিভ্রান্তি যা ইচ্ছার বাস্তবায়নে প্রোথিত মূল অথচ যথার্থতার সঙ্গে এটার কোনো সাযুজ্য নেই। আসলে কবি সর্বদাই সামাজিক অবস্থানে, যারা মধ্যম তাদের চেয়েও, অনেক বেশি ক্ষুদ্র ও দুর্বল। ফলে পার্থিব অস্তিত্বের ভার সে অন্যান্য মানুষের তুলনায় অধিক প্রগাঢ় ও দৃঢ় ভাবে অনুভব করতে বাধ্য হয়। তার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে তার কবিতা আসলে আর্তনাদস্বরূপ। শিল্প শিল্পীর কাছে কেবলমাত্র যন্ত্রণার আস্বাদন, অথচ এই শিল্প সৃষ্টির মধ্যদিয়েই শিল্পী নিজেকে উন্মোচিত করে অধিকতর যন্ত্রণার জন্য। সে কিছু এমন অমিত শক্তিধর নয়। বলা চলে উজ্জ্বল বর্ণের পালকে আচ্ছাদিত এক পক্ষী যে তার নিজের অস্তিত্বের খাঁচায় বন্দী।'

'আপনিও কী?' জিজ্ঞাস করলাম।

'আমি তো প্রায় এক অসম্ভব পাখি', বললেন ফ্রান্সৎ কাফকা। 'আমি একটা দাঁড়কাক—কাফকা। তেইন ক্যাথিড্রালের পাশে যে কয়লার দোকান, তার মালিকের একটা আছে। তুমি কি ওটা দেখেছ?

'হ্যাঁ, ওটা তো দোকানের চারপাশে ওড়াউড়ি করে।'

'ঠিক, আমার আত্মীয়টি আমার থেকে বেশি সুখেই আছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে ওর ডানাদুটোই ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। আমার বেলায় অবশ্য তার কোনো প্রয়োজন হয়নি, কারণ আমার ডানা তো ইতিমধ্যে হয়েছে ক্ষীয়মাণ। আর তাই আমার নেই কোনো উচ্চতা ও দূরত্ব। আমি কেবল বিভ্রান্ত হ'য়ে আমার অনুরূপদের মাঝখানে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াই। তারাও আমাকে গভীরতর এক সন্দেহের চোখে দেখে। এবং যথার্থই আমি একজন ভয়াবহ পাখি, একজন তস্কর, একটি দাঁড়কাক। অবশ্য এটাও একটা বিভ্রান্তিমাত্র। বস্তুত, আমি যা কিছু চকচকে, উজ্জ্বল তা স্পর্শে বুঝতে পারি না। আমার তেমন চকচকে কালোপালক পর্যন্ত নেই—তা এই কারণেই। আমি তো ধূসর, ভস্মের মতো। একজন দাঁড়কাক যে পাথরের আড়ালে লুকোবার ইচ্ছায় রয়েছে। এ সব কেবল ঠাট্টা, যাতে তুমি অনুভব না করতে পার আজকে আমার সব ব্যাপারটাই কত খারাপ চলছে।'

আমার স্মরণ নেই আর কতবার আমি কাফকাকে তাঁর দফতরে দেখতে গিয়েছি। একটা ছবি আমি সর্বদাই মনে রেখেছি, তাঁর চেহারাটা—দফতর

ছুটি হবার আধঘণ্টা আগে কর্মচারী বীমা সংস্থার দ্বিতীয়তলের দরোজা খুলেই যেমনটি তাঁকে দেখতাম।

তিনি তাঁর ডেস্কের পেছনে বসে আছেন, মাথাটা হেলান, পা দুটো সামনে ছড়ানো, দুহাত ডেস্কে পেতে রাখা। ফিল্লার চিত্র, 'দস্তয়ভস্কির একজন পাঠক' এর মতো যেন। ফিল্লার ছবি ও কাফকার দেহগত মিল অত্যন্ত গভীর। যদিও এই সাযুজ্য কেবল বাহ্যিক। এই আকৃতিগত মিল সত্ত্বেও অন্তর্লীন বৈপরীত্য অত্যন্ত বেশি।

ফিল্লার 'পাঠক' যেন কোনো কিছুর প্রভাবে অবিকৃত, আর কাফকার ব্যাপারটা হচ্ছে কেবল স্বেচ্ছায় অর্থাৎ বিজিতের আত্মসমর্পণ। তাঁর পাতলা ঠোঁটে এক হালকা মৃদু হাসির খেলা, মনে হয় যেন দূরবর্তী কোনো আচাভুয়া আনন্দের প্রতিচ্ছায়া মূর্ত হয়েছে তাঁর মৃদু হাসির কম্পনে, যা তাঁর আপন স্বতজাত নয়। তাঁর চোখ সর্বদা অন্যের দিকে তাকানো যেন একটু নিচ থেকে ওপর দিকে প্রক্ষেপণ। ফলে ফ্রানৎস কাফকা দেখতে খানিকটা বিশিষ্ট, যেন তাঁর দৈর্ঘ্য ও কৃশকায়তার জন্য সর্বদাই ক্ষমাপ্রার্থী। যেন সমস্ত শরীর দিয়ে তিনি বলছেন, 'আমি, ক্ষমা করবেন, খুবই সাধারণ। যদি আমাকে আপনি এড়িয়ে যান তবে আসলে আপনি আমার একটা বিশেষ উপকার সাধিত করবেন।'

তাঁর কণ্ঠস্বর দ্বিধাময়, অরব-গম্ভীর-সুরেলা, অত্যাশ্চর্যরকম শীতল, যদিও কখনো মধ্যমগ্রাম ছেড়ে কণ্ঠস্বর ওঠা নামা করে না। কণ্ঠস্বর, ভঙ্গী, দৃষ্টিপাত, সব কিছু যেন অভিজ্ঞতা ও সততালব্ধ শান্তির বিচ্ছুরণ।

তিনি চেক ও জর্মান উভয় ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু বেশিটাই জর্মান। এবং তাঁর কথিত জর্মান বেশ দৃঢ় টানে অর্থাৎ চেকরা যেমন করে বলে—তেমনি। কিন্তু তাও নয়। মিলটা যেন বাইরের। ভেতরে ভেতরে অন্যান্য চেক ভাষা-ভাষীদের জর্মান উচ্চারণের তুলনায় তাঁর উচ্চারণ অনেক পৃথক।

আমি জর্মান ভাষার যে চেক উচ্চারণ বলছি তা আসলে বেশ কর্কশ। মনে হয় যেন ভাষাটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভাঙা হচ্ছে। কাফকার বেলায় কখনো তা মনে হয় না। মনে হয় যেন তির্যক কারণ ভেতরের উত্তেজনা, যেন প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি প্রস্তরখণ্ড বিশেষ। তাঁর বাক্যবন্ধ কঠিনতর হয় যেহেতু তিনি যথার্থ ও যথাযথ হ'তে প্রচেষ্টা পান ব'লে। ফলে তাঁর কথনভঙ্গী হ'য়ে ওঠে ব্যক্তিগত রীতি—গোষ্ঠীগত চরিত্র নয়। তাঁর কথা ঠিক যেন তাঁর হাতের মতোই!

তাঁর হাত দুটো দীর্ঘ, শক্তিশালী। হাতের পাতা ছড়ানো, সরু ও সূক্ষ্ম আঙুল, নখ চিকনো, চেপটা ও বেশ স্পষ্ট অথচ আঙুলের হাড় ও গাঁটগুলো কমনীয়।

যখন আমি কাফকার কণ্ঠস্বর, হাসি ও হাতের কথা ভাবি তখনি আমার পিতার একটা মন্তব্য মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'শক্তি যেন বিবেকবান রুচিশীলতার সঙ্গে মিলেছে। শক্তি, যা ছোটাছোটো জিনিসও কঠিন দেখে।'

* * *

যেদিন আমি ফ্রানৎস কাফকার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হলাম তার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একদিন প্রথম তাঁর সঙ্গে পদচারণায় গেলাম।

অফিসে তিনি বলেছিলেন চারটের সময় আলৎস্টোডতের রিঙ-এ হাস্ স্মৃতিসৌধের তলায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে। সেখানে তিনি আমার দেওয়া কবিতার খাতাটা ফেরত দেবেন।

আমি ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে উপস্থিত হলেও কাফকা এসে পৌছুলেন এক ঘণ্টা পরে। তিনি মার্জনা ভিক্ষার মতো বললেন, 'আমি কোনোদিন কোনো দেখাসাক্ষাতের নির্ধারিত সময় রাখতে পারি না। আমি সর্বদা দেরিতে পৌছুই। যদিও মনে মনে প্রায় প্রতিজ্ঞা করেই ফেলি ঠিক সময়ে পৌছাবো, সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় রক্ষার জন্য আমার মহৎ ইচ্ছের কোনো ত্রুটি থাকে না, অথচ হয় পারিপার্শ্বিক কারণ অথবা শরীর আমার এই ইচ্ছে রক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেন আমার নিজের দুর্বলতা নিজের কাছেই স্পষ্ট ক'রে তুলতে।'

আমরা আলৎস্টোডতের রিঙ ধ'রে হাঁটতে লাগলাম।

কাফকা বললেন আমার কিছু কবিতা প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়তো সম্ভব। ওগুলো ওটো পিক-কে দিতে চাইলেন।

'আমি এরমধ্যে ওদের সঙ্গে কথা বলেছি', উনি জানালেন।

আমি অবশ্য যাতে কবিতাগুলো প্রকাশ না করেন তার জন্য ওঁকে অনুরোধ করলাম।

হঠাৎ কাফকা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'অর্থাৎ তুমি প্রকাশ করার জন্য রচনা কর না?'

'না। আমার কবিতা আসলে একরকমের ক্ষীণ প্রচেষ্টা যাতে প্রমাণ হয় যে আমি সত্যি সত্যিই নির্বোধ নই।'

আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। ফ্রানৎস কাফকা ওঁর পরিবারের গুদোম ঘর তারপর নিজেদের বাস গৃহটি দেখালেন।

'অর্থাৎ আপনারা বিত্তবান', আমি বলেছিলাম।

কাফকা মুখের একটা ভঙ্গী করে বললেন: 'বিত্ত কী? কারো কাছে একটা পুরনো শার্টই হয়ত বা সম্পদ। অন্য অনেকে এক কোটিতেও নির্ধন। সম্পদ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে আপেক্ষিক তথা অস্থিকর। বস্তুত এটা একটা বিশেষ অবস্থা। সম্পদ, যা কিছু মানুষের অধিকারে আছে তার ওপর একটা নির্ভরতা সৃষ্টি করে। নতুন অধিকার ও আরো অধিক নির্ভরতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। এটা আসলে বস্তুনির্ভর অনিশ্চিন্ততা। কিন্তু—ও সব তো আমার পিতামাতার অধিকারগত, আমার নয়।'

কাফকার সঙ্গে আমার পদচারণা শেষ হ'ল নিম্নোক্ত আলোচনায়। আমাদের ভ্রমণ ঘুরে ফিরে পৌছে দিল কিনস্কী প্রাসাদের সামনে। সেখানে "হেরমান কাফকা" ব্যবসায়িক নাম-শোভিত গুদোমঘর থেকে একজন দীর্ঘ-দেহী স্থূলকায় ব্যক্তি গাঢ় রঙের ওভারকোট ও চকচকে টুপি মাথায় বেরিয়ে এলেন। আমাদের থেকে পাঁচ-ছ পা দূরে এসে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। তারপর যেই আমরা কাছাকাছি এসে গেলাম অমনি উঁচু গলায় বললেন: 'ফ্রানৎস। বাড়ি যাও। হাওয়াটা বেশ ভেজা।'

অদ্ভুত মোলায়েম গলায় কাফকা উত্তর দিলেন: 'আমার বাবা। আমার সম্পর্কে খুবই চিন্তিত। ভালোবাসা কখনো কখনো জোরজুলুমের মুখোশ পড়ে। আমার ওখানে এসো আবার।' আমি মাথা নত ক'রে সম্মতি জানালাম। কাফকা করমর্দন না করেই চলে গেলেন।

* * *

ডাকে ওঁর 'ইন আ নীনাল কোলোনি' গল্পটার প্রুফ কপি পাওয়ার সময়ই ওঁর অফিসে গেলাম কাফকার সঙ্গে দেখা করতে। নাজেনেই কাফকা ধূসর রঙের খামটা খুলে ফেললেন। কিন্তু যখন তা থেকে বেরিয়ে এলো সবুজ ও কালো বাঁধাই গ্রন্থটি আর যখন উনি গ্রন্থটি ওঁর নিজেরই রচনা ব'লে চিনতে পারলেন —খুব খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

ড্রয়ারটা খুললেন, তাকালেন আমার দিকে, ড্রয়ারটা বন্ধ ক'রে, বইটা আমাকে দিলেন।

'তুমি নিশ্চয়ই বইটা দেখতে চাইছ।'

আমি একটু হেসে জবাব দিলাম, বইটা খুলে দ্রুত ছাপা ও কাগজের মান দেখে তাকালাম ওঁর দিকে। বুঝতে পারছিলাম স্নায়ুর পরিস্থিতি।

'বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে', বললাম। ড্রুগুলিন প্রেসের প্রকাশনার উপযুক্তই হয়েছে। আশাকরি আপনিও খুব খুশি হয়েছেন।'

'ঠিক তা হই নি' বললেন ফ্রানৎস কাফকা। বইটা অবহেলায় ড্রয়ারে ঢোকাতে ঢোকাতে। আমার কোনো অসতর্ক রচনা প্রকাশিত হলেই আমি বিমর্ষ হ'য়ে পড়ি।'

'তাহ'লে এটা ছাপার অনুমতি আপনি দিলেন কেন?'

'সেটাই তো! ম্যাক্স ব্রড, ফেলিক্স হ্বেল্টস্, এরা, আমার বন্ধুরা সবসময়ই আমি যা কিছু লিখি সব নিয়ে নেয় আর কোনো প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তি করেই আমাকে না জানিয়ে চমকে দেয়। আমি তাদের কোনো লজ্জাকর পরিস্থিতিতে ফেলতে চাই না আর তার ফলে সেইসব রচনাই প্রকাশ পায় যা বস্তুত হয় কোনো ব্যক্তিগত নোটস্ অথবা বিনোদনমূলক ভাবনামাত্র। আমার ব্যক্তিগত মানবিক দুর্বলতাসমূহ প্রকাশ পাচ্ছে সেই কারণেই। এমন কী বিক্রিও হচ্ছে, কারণ আমার বন্ধুজনেরা ম্যাক্স ব্রডকে নেতা মেনে এই ধারণায় উপনীত যে এসব থেকেই সাহিত্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমার দিক থেকেও এইসব নিঃসঙ্গতার চিহ্নগুলো নষ্ট করে ফেলার সাহসিকতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।'

একটু থেকে কণ্ঠস্বর পাল্টে বললেন: 'এক্ষুণি তোমাকে যা বললাম তা একটু অতিশয়োক্তি, বলতে পারো আমার বন্ধুদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত উক্তি। বস্তুত আমি নিজেই এতো নষ্ট এবং নির্লজ্জ যে ওসব রচনা প্রকাশের জন্য সহায়তা করেছিলাম। নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য আমি আমার পারিপার্শ্বিকতার চাপ বিশেষ প্রবল হিসেবে দেখাতে চেয়েছি। এটাও একধরণের প্রবঞ্চনা। কিন্তু আমি তো আসলে একজন আইনবিদ্, আমার পক্ষে তাই যা অশুভ তার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়।'

* * *

ফ্রানৎস কাফকা তরুণদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাঁর গল্প 'দি স্টোকার'-তো কমনীয়তা ও সহানুভূতি পূর্ণ। আমরা যখন মিলেনা জেসেন্সকার চেকভাষায় গল্পটির অনুবাদ বিষয়ে আলোচনা করছিলাম তখন এই কথাটা ওঁকে বলেছিলাম। গল্পটার চেক অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'কেমুয়েন্' নামক সাহিত্য পত্রিকায়।

'আপনার গল্পে রয়েছে যেমন ঝকঝকে সূর্যালোক তেমনি গভীর প্রাণাবেগ। রয়েছে প্রবল প্রেম—যদিও তা কখনো উচ্চারিত হয়নি।'

'এসব কিন্তু গল্পে নেই, রয়েছে গল্পের বিষয়ে—যৌবন।' কাফকা গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন। 'যৌবন তো যেমন সূর্যালোক তেমনি প্রেমে পরিপূর্ণ। যৌবন সুখের—কারণ সৌন্দর্য দর্শনের ক্ষমতা তো এই সময়েরই ক্ষমতা। আর যখন এই ক্ষমতা লোপ পায়—তখন সুরু হয় বার্ধক্য, ক্ষয়, সুখহীনতা।'

'তবে সুখের সম্ভাবনাকে বয়সই বাদ দেয়?'

'না সুখই ত্যাগ করে বয়স।' হেসে, মাথাটা সামনের দিকে নুইয়ে দিলেন, যেন তাঁর একটু কুঁজো পিঠের আড়ালে লুকাতে চাইলেন তার মুখ। 'যাঁরা নিজের সৌন্দর্য্য দর্শনের ক্ষমতা জীইয়ে রাখতে পারেন তাঁরা আসলে কখনো বৃদ্ধ হন না।'

তাঁর হাসি, তাঁর ভঙ্গী, কণ্ঠস্বর একজন শান্ত ও পবিত্র বালকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'তারপর "দি স্টোকার" গল্পে আপনি খুবই তরুণ ও সুখী।' আমি কথাটা শেষ করার পূর্বেই, লক্ষ্য করলাম, তাঁর মুখের চেহারা কেমন ছায়ান্ধকার হ'য়ে গেল। "দি স্টোকার" আসলে খুবই ভালো, আমি দ্রুত যোগ করলাম, কিন্তু ততক্ষণে কাফকার গভীরধূসর দু চোখ বেদনায় ভ'রে গেল।

'যা নিজের কাছে অজানা তাই লোকে ভালো বলে। কারণ সে তা প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। দি স্টোকার আসলে এক স্বপ্নের স্মৃতি, যা হয়তো কখনো বাস্তবে ছিলো না। কার্ল রোস্মান তো জু নয়। কিন্তু আমরা জু'রা জন্মাই বৃদ্ধ হ'য়ে।'

* * *

অন্য একদিন যখন আমি ভক্টর কাফকাকে একটা শিশুঅপরাধের ঘটনা বলছিলাম তখন আমরা পুনরায় ওঁর গল্প 'দি স্টোকার' বিষয়ে আলোচনা করলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম-ষোল বছরের চরিত্র কার্ল রোস্মান কী বাস্তবের কোনো প্রতিচ্ছায়ায় রচিত।

ফ্রানৎস কাফকা বললেন, 'আমার সামনে অনেক মডেল ছিলো, আবার ছিলো না। কিন্তু সে সব তো পুরনো দিনের কথা।'

'তরুণ রোস্মান আর স্টোকারের চরিত্র দুটিই জীবনের উত্তাপে পূর্ণ।' আমি বললাম। কাফকার মুখের উপর আবার অন্ধকারের ছায়া পড়লো।

'ওটাকে বলতে পারো বাইপ্রডাক্ট। আমি মানুষের বর্ণনা করিনি। কেবল একটা গল্প বলছিলাম। ওরা সব কল্পপ্রতিমা, শুদ্ধমাত্র কল্পিত প্রতিমা।'

'তবে তো একটা মডেল অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ কল্পপ্রতিমা সর্বদাই দৃষ্ট বস্তু নির্ভর।'

কাফকা একটু হাসলেন।

'মনের অন্তর্লীন কথা প্রকাশ করার জন্য বস্তুর প্রতিচ্ছবির প্রয়োজন পড়ে। আমার গল্পগুলো আসলে একধরনের নিজের চোখ বন্ধ করার ব্যাপার।'

* * *

তাঁর রচনা নিয়ে যে কোনো আলোচনাই সর্বদা সংক্ষেপ হতো।

'আমি এখন "দি ভারডিক্ট" পাঠ করছি।'

'তোমার ভালো লাগছে?'

'ভালো লাগছে? বইটি তো ভীতিপ্রদ!'

'তুমি ঠিকই বলেছ।'

'আমার জানতে ইচ্ছে করছে আপনি কী ক'রে এটা লিখতে আরম্ভ করলেন। উৎসর্গ পত্রে, "এফ-এর জন্য"—কথাটা নিশ্চিত কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার্থে নয়। আপনি সম্ভবত এই লেখাটির মাধ্যমে কাউকে কিছু একটা বলতে চেয়েছেন। তাই রচনার প্রসঙ্গটা আমার জানতে ইচ্ছে করছে।'

কাফকা একটু বিহ্বল হাসি হাসলেন।

'আমি বোধকরি প্রশ্নটা ক'রে ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছি। আমাকে মার্জনা করবেন।'

'মার্জনা ভিক্ষের কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষ পড়াশুনো করে, প্রশ্ন করার জন্যই। "দি ভারডিক্ট" আসলে একটি রাত্রির অপচ্ছায়া।'

'যদি অর্থটা একটু বিশদ করেন।'

'এটা বস্তুতই অপচ্ছায়া', তিনি পুনরায় বললেন, দূরের দিকে একাগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে।

'তবুও আপনি এই রচনাটি সৃষ্টি করেছেন।'

'শুদ্ধমাত্র প্রতিপাদনের জন্য, এবং তাই পুরোপুরি ভূত তাড়ানোর মতো, রাত্রির ভূত।'

* * *

আমার বন্ধু আলফ্রেড কাম্প, ফকমাউ-এর নিকটবর্তী আল্টসাত্তেল-এর

বাসিন্দা, যার সঙ্গে আমার বন্ধুতা হয়েছিল এলবোজেন-এ—কাফকার গল্প "দি মেটামরফোসিস"-এর প্রশংসা করেছিলেন। সে এই লেখককে বর্ণনা করলেন, 'আনকোরা, গভীরতর, এবং সে কারণেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ একজন এডগার আলেন পো।'

একদিন আল্টস্টাডটের চক্করে পদচারণার সময় আমি কাফকাকে তাঁর এই নবতম ভক্তের কথা জানালাম। কিন্তু একথা যেন তাঁর কানেই পৌছাল না, তিনি উৎসাহও প্রকাশ করলেন না। পক্ষান্তরে দেখে মনে হ'লো তাঁর রচনা নিয়ে কোনো আলোচনাও তাঁর পক্ষে রুচিহীনতা। আমি, যেহেতু, নূতন আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হ'য়ে ছিলাম, তাই অকৌশলীর কাজ করেছিলাম।

'গল্পের নায়কের নাম শামশা', বললাম, 'শুনে মনে হয় যেন কাফকারই সংকেতলিপি। দুটো শব্দেই পাঁচটি করে অক্ষর। শামশা শব্দে "শ" আর কাফকা শব্দে "ক"—দুয়ের অবস্থানই একধরণের। আবার "া"… '

কাফকা এখানে আমাকে থামিয়ে দিলেন।

'এটা আসলে কোনো সংকেতলিপি না। শামশা যে কেবল কাফকা তাই নয়, এ আর অন্য কিছুই নয়। "দি মেটামরফোসিস" কোনো স্বীকৃতিমূলক রচনা নয়, যদিও—কোনো এক অর্থে এটা একটা হঠকারীতা।'

'আমি, এ বিষয়ে কিছুই জানি না।'

'নিজের পরিবারের ছারপোকা সম্পর্কে আলোচনা করা কী রুচিসম্মত ও বিচক্ষণ কাজ?'

'সভ্যসমাজে নিশ্চয়ই এ কাজ স্বাভাবিক ব'লে গ্রাহ্য নয়।'

'তবেই বোঝ, কী নিন্দাজনক আমার আচরণ।'

কাফকা হাসলেন। তিনি চাইছিলেন বিষয়টা বর্জন করতে। অথচ আমি ইচ্ছে করছিলাম না।

'আমার মনে হয় না যে এ-ক্ষেত্রে সদাচারণ ও কদাচারণের তুল্যমূল্য বিবেচিত হতে পারে।' আমি বললাম। 'দি মেটামরফোসিস—এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন, ভয়ঙ্কর কল্পনা।'

কাফকা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'স্বপ্ন সত্যকে উদ্ঘাটন করে, সেখানেই কল্পনা খাটো। এটাই জীবনের বিভীষিকা—আর শিল্পের ভীতি। কিন্তু এখন আমি নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরবো।'

হঠাৎ কেমন যেন বিদায় নিলেন।

আমি কী তাঁকে তাড়িয়ে দিলাম ?

খুব লজ্জা করছিল।

* * *

প্রায় এক পক্ষকাল আমাদের দেখা হ'ল না। আমি ইতিমধ্যে যে সব বই গোগ্রাসে গিলেছি সেগুলো সম্পর্কে তাঁকে জানালাম। কাফকা হাসলেন।

'জীবন থেকে অনেক গ্রন্থ নিষ্কাশন তুলনামূলক ভাবে সহজ, কিন্তু গ্রন্থ থেকে কত কম, কতই না কম জীবন পাওয়া যায়।'

'তবে কী বলবো সাহিত্য আসলে মন্দ সংরক্ষণকারী ?'

তিনি হাসতে হাসতে মাথা নোয়ালেন।

* * *

দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম ফ্রানৎস কাফকা নিজের অফিসে ব'সে রেক্লাম-বুথেরেই-র একটা তালিকা পাঠ করছেন।

'বই-এর নামের তালিকায় আমি মাতাল হ'য়ে যাচ্ছি" কাফকা বললেন। 'গ্রন্থ আসলে নেশা ধরায়।'

আমি আমার হাতব্যাগটা খুলে তাঁকে ওটার ভেতরের জিনিস দেখলাম।

'আমার তো হাসিসের নেশা, ডক্টর।'

কাফকা খুব আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন।

'অন্য কিছু নয়, কেবল নূতন পুস্তক !'

আমি হাতব্যাগটা তাঁর লেখার টেবলের উপর, উপুড় করে দিলাম। কাফকা একটার পর একটা বই তুলতে লাগলেন, পাতা ওল্টালেন, এখানে সেখানে কোনো কোনো পংক্তি পাঠ করলেন, এবং আমাকে ফেরৎ দিতে থাকলেন বইগুলো।

'তবে তুমি এই সবগুলো পাঠ করবে ?'

মাথা নোয়ালাম।

কাফকা ঠোঁট সংকুচিত করলেন।

'যে সব রচনা সাময়িক তা নিয়ে তুমি দীর্ঘ সময় কাটাও। আধুনিক কালের অধিকাংশ গ্রন্থই আসলে সমকালের কম্পিত প্রতিচ্ছবি। তাই মিলিয়েও যায় খুবই দ্রুত। পুরনো দিনের গ্রন্থাবলীই তোমার বেশি পাঠ করা উচিত। যাকে ধ্রুপদী বলা হয়। গ্যয়টে। যা পুরানো প্রকাশিত তার গভীরতর মূল্য—স্থায়ীত্বে। যা শুধুমাত্র নবতম তাই তো দ্রুত বিলীয়মান। আজ হয়তো যা সুন্দর, কাল তাই মনে হবে হাস্যকর। সাহিত্যও তেমনি নিয়মে চলে।'

'আর কবিতা ?'

'কবিতা জীবনের রূপান্তর ঘটায়। কখনো তা আরো খারাপ।'

দরোজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। আমার পিতা প্রবেশ করলেন।

'আমার পুত্র কী বিরক্তিকর কিছু করছে ?'

কাফকা মৃদু হাসলেন।

'ও, না, আমরা ভূত-প্রেত নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

* * *

আমার চোখে যে ঘুম জড়িয়ে আছে—তা কাফকা লক্ষ্য করেছিলেন। আমিও তাঁকে সত্যই বলেছিলাম : 'আমার মনের ভেতর এতো বিষয় জমে ছিলো যে আমাকে ভোর পর্যন্ত লিখতে হয়েছে।' কাফকা তার দীর্ঘ বাহুদুটি—দেখতে যে কাঠ কুঁদে তৈরির মতো—টেবলের উপরে ছড়িয়ে রেখে খুব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন : 'কেউ যদি নিজের মনের ভাবনাগুলি সহজে প্রকাশ করতে পারে তবে তার তুল্য আর কোনো সুখ নেই।'

'আমার যেন মনে হচ্ছিল আমি মাতাল হ'য়ে গেছি। এমন কী আমি যা লিখেছি তা এখনও আমি পাঠ ক'রে উঠতে পারি নি।'

'ঠিকই তো। যা কিছু রচিত হয় সব আসলে অভিজ্ঞতার সারাৎসার।'

* * *

আমার বন্ধু আর্ণস্ট লেডেরার জলছবি ওয়ালা হাতে তৈরি কাগজেই সাধারণত খুব উজ্জ্বল নীল মসীতে লিখতো।

আমি কাফকাকে কথাটা বললাম।

তিনি বললেন, 'এটাই তো স্বাভাবিক। প্রত্যেক ঐন্দ্রজালীকেরই একান্ত নিজস্ব নিয়ম কানুন থাকে। হেডন, যেমন, আড়ম্বর সহকারে পাউডার লাগানো পরচুলা পরতেন। রচনাকর্মও, বস্তুত, একধরণের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যদিয়ে আবছায়াদের আবাহন।'

* * *

ফ্রানৎস কাফকা অনেকবারই আমাকে বলেছেন আমার "অমিত্রাক্ষর অসতর্করচনার" কিছুকিছু তাঁকে দেখাতে। মদীয় লেখা বিষয়ে বর্ণনাটা আমারই। আমি তাই আমার নোটবইটা ঘেটেঘুটে কিছু যোগ্য অংশ, ছোটো ছোটো গদ্যাংশ একত্র ক'রে—"নিরয় নিবাসের মুহূর্ত" নাম দিয়ে কাফকাকে দিলাম।

দীর্ঘ কয়েক মাস পরে কেবল তাত্রানস্কে মাতলিয়ারির আরোগ্যনিবাসে যাবার প্রস্তুতির মুহূর্তে তিনি আমার পাণ্ডুলিপিটি ফেরৎ দিলেন।

বললেন : 'তোমার লেখা সবগুলো কাহিনীই এতো তীব্রভাবে তরুণ। বস্তু ও উপলক্ষ্য বিষয় থেকেও তুমি অনেক বেশি প্রকাশ করো। সেই সব আবেগ যা বস্তু ও উপলক্ষ্যের অস্পষ্ট অনুভূতি সঞ্জাত। তাই গীতি কবিতা॥ তুমি বিশ্বটাকে আঁকড়িয়ে না ধরে, ধর চুম্বনে।'

'তাহ'লে কী আমার রচনা অর্থহীন?'

কাফকা আমার হাত আঁকড়িয়ে ধরলেন।

'আমি সে কথা বলিনি। এই ক্ষুদ্র কাহিনীগুলো তোমার কাছে অবশ্যই অতীব মূল্যবান। প্রত্যেকটা লিখিত শব্দই তো ব্যক্তিগত দলিল। কিন্তু শিল্প.....'

'শিল্প তো অন্যকিছু', আমি বেদনায় যোগ করলাম।

'তোমার রচনা এখনও শিল্প হ'য়ে ওঠেনি, কাফকা খুব জোরের সঙ্গে বললেন। 'এই আবেগ ও অনুভূতির বর্ণনা আসলে অধিকংশ ক্ষেত্রেই পৃথিবীর জন্য অন্ধ সংকোচে হাতড়ানি। তোমার দুচোখ স্বপ্নের মায়ায় এখনো ভারী। কিন্তু কোনো একসময় তা শেষ হবে এবং যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে এমনি ভাবে তুমি হাতড়ানিতে মগ্ন তোমার দুহাত তুলে নেবে। হয়তো আর্ত চিৎকার করবে, শুরু হবে অসম্ভব তোতলামি, অথবা দুপাটি দাঁত কড়মড় করবে আর দু'চোখ হ'য়ে উঠবে বিস্ফারিত, বিপুল বিস্ফারিত। কিন্তু—এসব তো কেবল শব্দের সম্ভার। শিল্প সর্বদাই সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নির্ভর ব্যাপার। আর তাই শিল্প মূলত বিয়োগান্তিক।'

ফ্রানৎস কাফকা সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি জিজ্ঞাসার একটি প্রশ্নপত্র আমাকে দেখালেন। মনে হয়, প্রেজার প্রেসের রবিবাসরীয় সাহিত্য পাতার জন্য ওটো পিক সমীক্ষাটা চালাচ্ছিলেন। তর্জনী দিয়ে প্রশ্নপত্রটি দেখিয়ে পাঠ করলেন, 'আপনার সাহিত্যবিষয়ক ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটা কি?' এবং তিনি হেসে ফেললেন।

'কী প্রচণ্ড মূর্খ। সম্ভবত একজন লেখকের পক্ষে এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব।'

আমি কথাটা গূঢ়ার্থ না বুঝতে পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'আগামী কাল তার হৃদস্পন্দনটা কেমন থাকবে একথাটা কী কেউ আজ বলতে পারে? না, তা কখনোই সম্ভব নয়। যদিও কলমই তো হৃদয় ক্ষেত্রে ভূকম্পলিক পেন্সিল। তাই তা ভূকম্পনের চিহ্ন ধরবে অথচ তার পূর্বাভাস দিতে পারবে না।' (ক্রমশ)

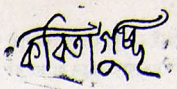

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার। বর্তমানে তিনি কলকাতার একজন খ্যাতনামা প্যাথলজিস্ট এবং একটি সরকারি হাসপাতালে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত। শুধু এটুকুই তাঁর পরিচয় নয়, বরং বলা উচিত এখান থেকেই শুরু। তাঁর শখ ও বেশ অনেক প্রকার, যেমন তিনি ডাক টিকিট সংগ্রহের একটি বিশেষ শাখায় (যার নাম 'এরো-ফেলাটেলি') বিশেষজ্ঞ, এ রকম ডাক-টিকিট প্রতিযোগিতার জুরি বা বিচারক হিসেবে তাঁকে স্বদেশে ও বিদেশে অনেক জায়গায় যেতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ সম্পর্কে যাবতীয় গ্রন্থের তিনি সংগ্রাহক, সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে তাঁর কাজ অনেক গবেষককে হার মানাবে। রাগাশ্রয়ী গানের রেকর্ড সংগ্রহের দিকেও তাঁর প্রবল ঝোঁক। অনেকের ধারণা যে ব্যস্ত ডাক্তাররা অন্য কিছু পড়াশুনো করবার সময় পান না, আমরাও এরকম ধারণা ছিল, ইদানীং কয়েকজন প্রখ্যাত চিকিৎসকের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে আমার সে ভুল সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পেশায় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েও কী করে যে এত বই পড়ার সময় পান তা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে নিয়মিত যাতায়াত করেন, বই লেখেনও অজস্র। আধুনিক ইংরিজি সাহিত্যের অনেক গল্প উপন্যাসের খবর আমি তাঁর কাছ থেকে

পাই। আবার বাংলা পত্র পত্রিকা প্রত্যেকটিই তিনি কিনে খুঁটিয়ে পড়েন, উল্লেখযোগ্য নতুন বাংলা বই তাঁর লাইব্রেরিতে অচিরে স্থান পায়।

তাঁর হৃদয় সব সময়ই নতুন কিছু গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত, তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ।

ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রেম কিন্তু কবিতা। নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত যে-মানুষটির পরিচয় দিলুম, আশ্চর্য সেই মানুষটি কিন্তু অতি রোমান্টিক ও লাজুক প্রকৃতির। দিনের শেষে রক্ত-মাংস-পুঁজ ঘাঁটা হাত ধুয়ে ফেলে তিনি চলে যান শরীর-অতিরিক্ত যে অনুভূতির জগৎ, সেই দিকে।

ধ্রুবজ্যোতি কৈশোরে বা ছাত্রাবস্থায় কবিতা লিখতেন কি না আমি জানি না। তিনি কোনো সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সঙ্গে ছিলেন না, আবার কোমর বেঁধে কবিতা লেখার পাঠও গ্রহণ করেননি তিনি। তাঁর কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত। আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয়, তখন আমি তাঁর মুখে-মুখে ছড়া বানানো শুনে চমৎকৃত হয়েছি। সেগুলো নিছক সাধারণ মজার জন্য ছড়া-কাটা নয়। আজকের সংলাপের মধ্য থেকে বিশেষ একটা মুহূর্তের ছবি খুঁজে নেওয়া এবং মিল দেবার দক্ষতা দেখে সচকিত হয়ে উঠতে হয়। চকিত সুন্দর মিল তাঁর মাথায় এত সাবলীল ভাবে আসে। যা সত্যিই ঈর্ষণীয়। ধ্রুবজ্যোতি এরকম তাৎক্ষণিক ছড়া অন্তত হাজার খানেক রচনা করেছেন ইতিমধ্যে কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে তিনি উদাসীন, সেগুলিকে তিনি অনায়াসে হারিয়ে যেতে দেন। কেউ কেউ সেই সব ছড়া সংগ্রহ করে রাখার প্রস্তাব করলে, উনি হেসে বলেন, কী হবে!

শুধু মৌলিক ছড়া-রচনা নয়। ধ্রুবজ্যোতি গোপনে গোপনে কাগজ-কলমেও কবিতা রচনা করেন। সেই গোপনীয়তা সম্প্রতি ফাঁস হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

ধ্রুবজ্যোতির কবিতায় ফুটে ওঠে একটি মানব-দরদী মন এবং ভালোবাসার জন্য ব্যাকুলতা। কখনো কখনো একটু তির্যক বিদ্রূপের ভাব ফুটে ওঠে, কিন্তু তারও মধ্যে থেকে যায় চাপা দুঃখবোধ। মানুষের নানা রকম, ভণ্ডামি দেখে তিনি কষ্ট পান। যারা নিজের। অত্যন্ত খাঁটি ধরনের মানুষ, তারা আশা করেন চার পাশের সব মানুষই যে রকম হবে, সে রকম যদি না মেলে তা বলে আশা-ভঙ্গের বেদনায় তাঁরা নিজেরাই বেশি কষ্ট পান। এই সঙ্গে প্রকাশিত কবিতা পঞ্চকে এইসব সুরই ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে একমাত্র 'স্বীকারোক্তি'

কবিতাটিতেই মনে হতে পারে, কবি যেন এখানে খুব উগ্রভাবে ভালোবাসার মূল্যবোধকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই কবিতার শব্দগুলি ও লাইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে যা উহ্য রয়েছে, তা ভালোবাসার জন্যই আর্তি। অর্থাৎ ভালোবাসার ব্যাজস্তুতি।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি কবিতা

কিরণমালা

কিরণমালা

ঐ চন্দ্রহার কি নতুন বানিয়েছ!
অবাধ্য বুকের ভাঁজে লকেটের হীরাটি কি ঠিকঠাক খাঁটি?
এ-রকম কত অলংকার প্রতি বছরেই এসে অধিকার করে তোমার শরীর
দ্যুতি আনে মেদমত্ত চিবুকে কপোলে
স্বামীটির জড়োয়া প্রণয় নিয়ে তোমার এই তাৎক্ষণিক খেলা
তারপর অলংকার একে একে ঢুকে যায় নিবদ্ধ আঁধারে,
লকারের অগণন ভেলভেট বাক্সের যেন নতুন বান্ধব।

অথচ এবারও গ্রামে গঞ্জে বরাদ্দ বন্যায়
ভেসে যাবে বাংলাদেশ—এরা সব বাৎসরিক ক্ষত
যেন ঈশ্বরই পিছিয়ে দেন ব্যথাদীর্ণ মানুষের পা।
ঈশ্বর বাঙালী নন তাই বাঙালীর
সুখ দুঃখ তিনি বুঝতেই পারেন না।
তুমিওতো তার খবর রাখো না,
সিনেমার পাতা ছাড়া খবরের দৈনিক কাগজে
কোথাও কি মুদ্রিত হয় অভিনয়প্রবণ স্বদেশ!
তোমার জগৎ শুধু অলংকারিক—চন্দ্রহার!
শুধু ভাবো কিরণমালা আরো কতোদিন
এই সব শরীরপিপাসু হারে সময়ের শবকে সাজাবে।

অবোধ

অফিসে যাবার সময় ঝুম্পা-ঝণ্টুর বাবা কথা দিয়েছিল,
কাল ওদের সার্কাসে নিয়ে যাবে ;
মাধবী তোরণ থেকে স্বীকে বলেছিল :
সাতটার ব্যাণ্ডেল লোকাল ভর্তি করে নিয়ে আসবে
ভুলে-যাওয়া সমুদ্রের ঢেউ, আর
পোহানোর উপযুক্ত সমীচীন আঁচ।

নটার পর ঝুম্পা-ঝণ্টু আর জাগতে পারেনা
ঘুম এসে চাপা দেয় উৎকণ্ঠ চোখের পিপাসা,
ওদের মা মাইল মাইল হেঁটে যায়
ঘর ও বাইরের দশ গজে,
ঘড়ির কাঁটা বার বার বৃত্ত আঁকে,
রাত চিরে শেষ গাড়ীটাও ছুটে যায় নিশ্চিত উদ্দেশে।
ঝুম্পা ঝণ্টুর মা জানতেও পারেনা
তার আকাঙ্ক্ষিত উষ্ণতার প্রতিশ্রুতি
ক্রমশঃ শীতল হচ্ছে শহরের লাশকাটা ঘরের টেবিলে।

কাদের গোপন হিংসা পাশবিক বজ্র হয়ে, কেন,
ঝুম্পা ও ঝণ্টুর শিশুস্বপ্ন ভেঙেছে কাঁচের মত,
কেন অন্ধ হিংস্র ঈর্ষা ওদের মার উষ্ণতা প্রার্থী
রাতগুলো আমৃত্যুকাল নিঃসঙ্গ স্মৃতি শান্ত হতে বাধ্য করে।
এ কেমন বিবেচনা, কিংবা কার রোষ ঈর্ষা অথবা খেয়ালে
ঝুম্পা ঝণ্টুর বাবা কথা দিয়েও সার্কাস দেখাতে ফেরে না।

গোপন নাম

তুলপুলিয়া টাইনিফ্লোরা নামে কোনো ফুল নেই হয়তো
পাহাড়ে পাথরে উচ্চতায় ফুটে থাকা নাম-না জানা
ছোট ছোট রঙ-বাহারী স্ফুরণে
এসো মনে মনে আদর করে ঐ নামে ফুলটিকে ডাকি !

বিজনবালা এখন আর কোনো মধুকণ্ঠীর নাম হয় না
তবু বিজনে নির্জনে মন-মাতানো সুর শুনলেই

নারীটিকে মনে মনে ঐ নামে দামী করে তুলি !
সাগর দাঁড়ি কোনো নতুন গ্রামের নাম হয় না
তবু যেখানেই অকস্মাৎ সাগর নিস্তরঙ্গ দাঁড়িয়ে পরে—ঐ মুহূর্তের
জলধিকে মনে মনে নতুন নামকরণ করি !

অভিমন্যু হয়তো কোনো শিশুর নাম হয় না
চড়কের মেলা থেকে কেনা টিনের তরোয়াল হাতে
কোনো শিশুকে দেখলেই এখন তাকে
অভিমন্যু বলে ডাকি !

ফুল, মেয়ে, গ্রাম, শিশু, সবারই পোশাকা নাম ছাড়া
আরও একটা সংগোপন নাম থাকে,
প্রাণের আড়ালে মাংসভাঙা আত্মা যেমন—
এক-একদিন হঠাৎ মনে পড়ে ঋণ
আবার অনেকদিন মনেও পড়েনা !

স্বীকারোক্তি

স্বীকারোক্তি লেখা থাক
নতুন অক্ষরে—
আমি কোনোদিন কাউকে ভালোবাসিনি।

কে ভ্রমর ? না তোমাকেও না
মদিরেক্ষণা কিশোরী, তুমি ছিলে নতুন টাকার মতো,
উদ্ধত যৌবনা তুমি আমার প্রথম প্রেম প্রেম খেলার
পুতুল,—আর কিছু নয় !

আমি কোনোদিন কাউকে বাসিনি ভালো,
কে সুনীতা ? না তোমাকেও না—
সাতপাক হেঁটে ফুল-চাপা বিছানায় এসেছিলে,

দেহে সুখ ভেঙেছিল, ভালোবাসা ছিল না মুঠোয়,
আমি তো ভালোবাসার অভিনয়ে বছর বছর,
স্বর্ণকমল পেতে পারি—অনায়াসে।

আমি কোনোদিন কাউকে ভালোবাসিনি,
কে সীমন্তিনী না, তোমাকেও না—
তুমি আমাকে নিজস্ব অ্যান্টিক সঞ্চয় ভেবেছিলে
কী ভুল—কী আমূল ভুল—
পঞ্চাশ হেমন্তে পৌঁছে চেয়েছি কেবল কি
নবনীত ঐহিক নারী
ভালোবাসা নয় নদীর উজানে বহুশ্রুত বেহুলার ভেলা।
এখনো অনেকদিন ভালোবাসার অভিনয় চাই
ভালোবাসার নিতান্ত ডাক্তারি শব-ব্যবচ্ছেদ চাই।
শরীরে শরীর ঢেলে আরো তাপ কেড়ে অক্ষরে মেশাতে চাই
—অদূরে অপেক্ষমান ছায়াভীরু শীতের সময়।

সমান্তরাল

দুটি রেখা সমান্তরাল চলেছে—
কোনো ডাক নেই, বাড়ানো হাতের ইসারাও নেই,
একদিন প্রেম ছিল উষ্ণ আলিঙ্গনও ছিল,
আজ শুধু ঘৃণা, স্মৃতির শরীর বেয়ে অপ্রেমের ঘাম।

ভালোবাসা অ্যালকোহল যেন—
উবে যায়, শূন্য থাকে মনোহর শিশি ;
ভালোবাসা থার্মোমিটার
চকিত অসাবধানে গুঁড়ো হয়ে যায়,
ভালোবাসা কর্পূরের দপকরা আগুন
নিভে গেলে আর জ্বলে ওঠেনা কখনো।

দুটি রেখা সমান্তরাল চলেছে—
পরস্পর হৃদয়ের শব্দ নিতান্ত অচেনা,
দুটি দেহ পাশাপাশি অপরিচিত শব,
রেখা দুটি তবু ঠিক উদ্দাম চলেছে—

Administration of Law & Justice—S. N. Bhattacharyya Rs. 25·00
Sunlti Kumar Chatterji Commemoration Volume—Bhakti P.Mllik (Ed.) Rs. 35·00
Geomorphology of the Subarnarekha Basin— S. C. Mukhopadhyay Rs. 50·00
Aspects of Indian Thought— Gopinath Kaviraj Rs. 25·00
THE UNIVERSITY OF BURDWAN : BURDWAN—713103

সম্পাদকীয়

বিভাবের সাতবছর পূর্ণ হলো। কোনো সাহিত্য-সংস্কৃতিপত্রের বয়সের নিরিখে প্রায় সাবালক হয়ে ওঠবার বয়স। এই বয়সন্ধির সময়ে আমরা যেমন অনেক উল্লেখযোগ্য ও স্মৃতিধার্য লেখা ছাপতে পেরেছি, অনেক পরিকল্পনা তেমন আমূল ব্যর্থ হয়েছে বিষয়ানুপাতিক যোগ্য লেখক ও লেখার অভাবে। নিজেদেরও ত্রুটি ছিল, অসুস্থতা ও নানা নিয়ন্ত্রণঅযোগ্য কারণে সম্পাদক-মণ্ডলীর অনেকেই গত কয়েকটি সংখ্যায় তেমন মন দিতে পারেননি। এটা অবশ্য পাঠকদের কাছেও অলক্ষ্য থাকেনি। অকৃপণ ভালবাসার কারণে তারা চিঠি দিয়েছেন। যথাসম্ভব ব্যক্তিগতভাবে উত্তরও দিয়েছি।

আরেকটি কারণও অবশ্য আছে। আমাদের বহু-বিজ্ঞাপিত ভারতীয় ভাস্কর্যের আন্তর্জাতিক সংখ্যার জন্য ও আমাদের গত দুবছর খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সংখ্যাটির মুদ্রণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। আগামী সংখ্যা (অক্টোবর—ডিসেম্বর) অর্থাৎ ডিসেম্বরেই এই মহামূল্যবান সংখ্যাটি ইংরেজিভাষায় প্রকাশিত হবে। পরে বর্ধিত কলেবরে গ্রন্থাকারেও বেরুবে। আপাতসংক্ষিপ্ত হলেও ভারতবর্ষে এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ প্রকাশনা এর আগে হয়েছে বলে জানা নেই। সম্পূর্ণ সূচী এই সঙ্গে ছাপা হলো। শুধু সময় ও পরিশ্রম নয়, যে অসম্ভবরকম ব্যয় এই সংখ্যাটির জন্য হচ্ছে ও হবে তাতে শুধু মাত্র গ্রাহক ছাড়া সকলের কাছে এই সংখ্যাটি পৌঁছে দিতে পারব বলে ভরসা হয় না। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সকলেই প্রয়োজনবোধে সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। সংগ্রহমূল্য বেশি হবেই। আমরা উপায়হীন। কবিতা ছাড়া আরেকটি বিষয়েও আমরা

আতঙ্কগ্রস্ত। ডাক বিভাগের কর্মকুশলতার মান দিনে দিনে যে হারে নেমে যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে তাতে বিদ্যুৎ বিভাগও লজ্জা পাবে। গ্রাহকদের কাছে কাগজ পৌঁছে দেওয়াই সমস্যা। ডাকে পাঠানো বহু কপি (যদিও আমরা কখনোই "আনডার সার্টিফিকেট অফ পোষ্টিং" ছাড়া কাগজ পাঠাই না) ক্রমাগত নিরুদ্দেশ। ডাকবিভাগের সাহিত্যপ্রীতি গত দুবছরে যে হারে বেড়েছে তার তুলনা নেই! বাংলার বাইরে অসংখ্য সাহিত্যপ্রীতিসম্পন্ন বাঙালী আছেন। কমারশিয়াল কাগজ কিছু কিছু গেলেও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যপত্রগুলি তারা প্রায় পাননা বললেই, চলে। এতদিন বিভাব-ই তাদের কাছে সবচেয়ে পৌঁছে বেশি যাচ্ছিল। বিভাবের গ্রাহকসংখ্যার সিংহভাগ তারাই। আমরা বহু-পরিশ্রমে ও ক্ষতিস্বীকার করেও এই পাঠকমণ্ডলী গড়ে তুলেছিলাম। এখন তাদের কাগজ অপ্রাপ্তির ক্রমাগত চিঠিতে ব্যাকুল হয়ে উঠছি। তাই নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তাদের অনুরোধ, আগামী ভাস্কর্য সংখ্যাটি তারা রেজিস্ট্রার ডাকযোগে নিন। আসলে সাধারণ ডাকে সংখ্যাটি পাঠাবোনা বলেই ঠিক করেছি। তাই আগামী বছরের গ্রাহকচাঁদার সঙ্গে রেজিস্ট্রী ডাকের খরচ যোগ করে টাকা পাঠাতে অনুরোধ করবো।

বিভাব এখন মোটামুটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সাতবছর পূর্ণ হলেও অনেক পরিকল্পনা, অনেক কর্তব্য অপূর্ণ থেকে গেছে। কর্তব্য তরুণ লেখকদের প্রতি। তরুণরা তাদের শ্রেষ্ঠ গদ্য ও কবিতা রচনাটি বিভাবে পাঠান। কবিতা যেহেতু একসঙ্গে গুচ্ছ কবিতা ছাপি, সেহেতু কবিতার ক্ষেত্রে প্রতিসংখ্যায় একজন বা দুজনের বেশি ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। এরজন্য মার্জনাপ্রার্থী।

সব শেষে, শারদ অবকাশ সকলের শান্তি ও স্বস্তিকে কাটুক এই প্রার্থনা।

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

BIVAV

Price Rs. 5.00 | Special Autumn Issue | Regd. No.
Vol. 6 No. 4 | July—Sept. '83 | R. N. 30017/76

Contribution of

The Durgapur Projects Limited

the Biggest State Undertaking of West Bengal

To build up the economic foundation of the country

270 MW THERMAL POWER STATION

Supplies power to :

Calcutta and the Industrial belt.

A new power station with 110 MW capacity is being added to increase its power contribution to Calcutta and its neighbourhood. This unit will come up in early 1984.

COKE OVEN PLANT

Supplies :

(1) B. P. Hard Coke to Steel Plants, Defence, Railways, Foundries within & outside the State of West Bengal.

(2) Byproducts like Tar and Tar Products, Benzene pure, Motor Benzol, Toluol (Industrial Grade), Light Solvent Naphtha, Carbolic Oil, Naphthalene Oil, Timber Pickling Oil, Anthracene Oil, Crude Naphthalene to :

Different Chemical & Paint Industries

Supply Gas to Calcutta

through

Oriental Gas Company's Undertaking &

Local Industries at Durgapur.

Supply 35 Million Gallons of WATER per day

to various local industries.